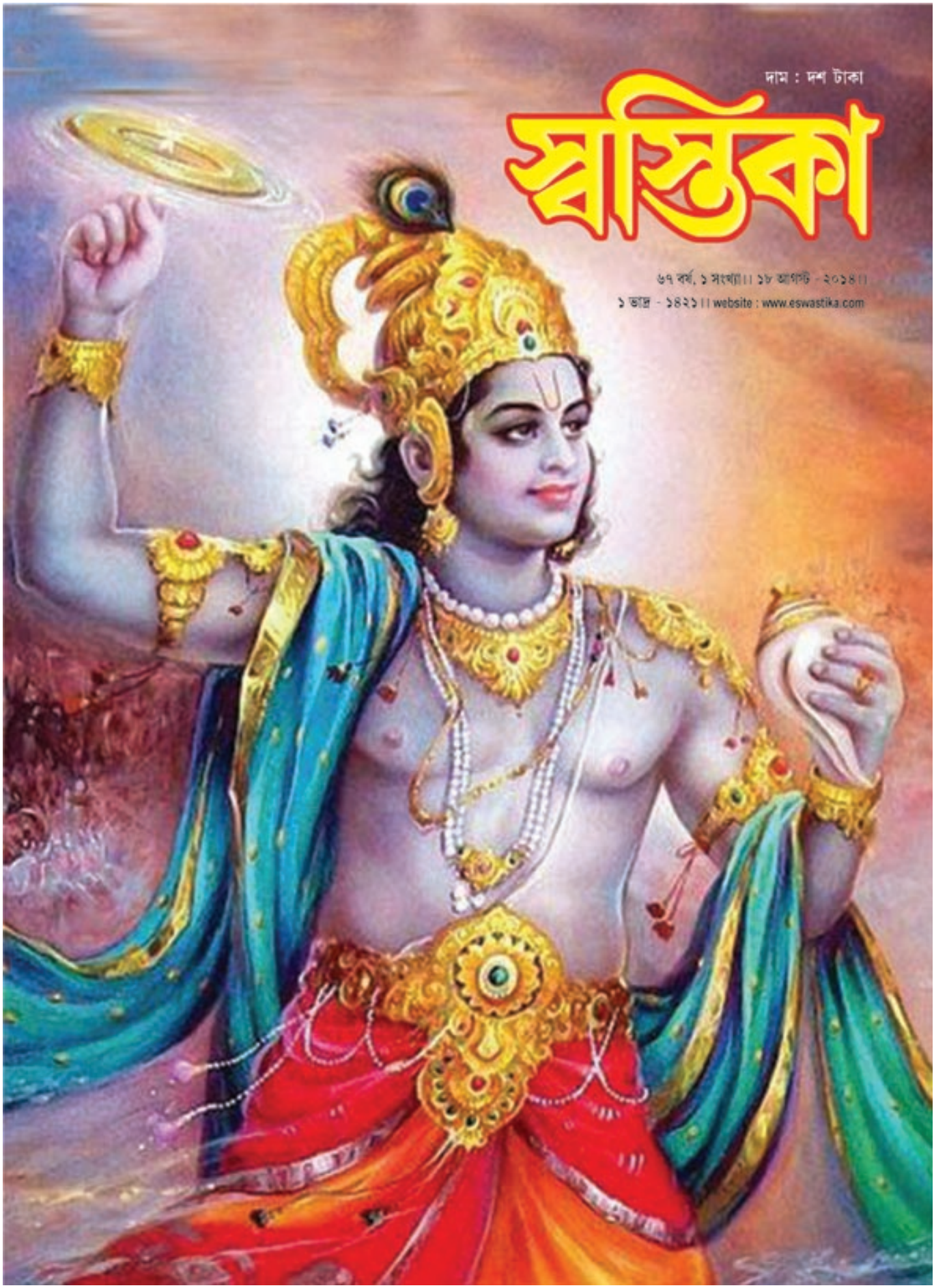

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ১৮ আগস্ট - ২০১৪।।
১ ভাদ্র - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ ১ সংখ্যা, ১ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৮ আগস্ট - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সংবাদমাধ্যমে ভোটলুট দেখেও কমিশনের পর্যবেক্ষকরা চোখ বন্ধ করে থাকেন ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : রতন টাটা, বড্ড ঠ্যাটা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ধর্মরক্ষায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ▯ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য ▯ ১২

পাপের ঘড়া যখন পরিপূর্ণ এবার কি সুধী সমাজকে রক্ষাকল্পে যুগাবতার আবির্ভূত হয়েছেন?
▯ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) ▯ ১৪

গীতাবর্ণিত অন্যায় বিনাশ : আজকের প্রেক্ষিতে
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৬

সজ্জন হিসেবে পরিচিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা কাদের জন্য প্রাণপাত করছেন? ▯ সুহাস বসু ▯ ১৮

রাঢ় বাংলার প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বিষ্ণুপুর ▯
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল ▯ ২১

মৌলবাদের বিষবৃক্ষ ▯ বলবীর পুঞ্জ ▯ ২৭

ইফতার : রাষ্ট্রের কাজ সর্বধর্ম রক্ষা করা, রাষ্ট্রীয় অর্থে কোনো ধর্ম লালন করা নয় ▯ এন সি দে ▯ ২৯

রাজনৈতিক ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যর্থতার সঙ্কটে বঙ্গ সিপিএম
▯ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩০

রাজনৈতিক কায়দা লুঠতে উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গায় মদত রাজ্য সরকারের ▯ ৩১

শ্রীকৃষ্ণ কি শাক্ত উপাসক ছিলেন? ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ৩৬

কৃষ্ণজননী দেবকী ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ **পুস্তক-প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯
সমাবেশ-সমাচার : ৩৮▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০**
▯ **চিত্রকথা : ৪১**

৬৭ বর্ষ পদার্পণে স্বস্তিকার শুভেচ্ছা

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৭তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, লেখক এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। — স্বস্তিকা পরিবার।

প্রকাশিত হবে ২৫শে আগস্ট ২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৫শে আগস্ট ২০১৪

অমিত শাহ বিশেষ সংখ্যা

সম্প্রতি বিজেপি-র জাতীয় পরিষদের বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে অমিত শাহ-এর নামে সিলমোহর লাগানো হলো। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি-কে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যে মুখ্য কারিগর তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। এবারে তাই প্রচ্ছদ নিবন্ধ—অমিত শাহ।

দাম একই থাকছে - ১০ টাকা ।। সত্বর কপি বুক করুন।।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্যে পরিবর্তনের পরিণতি

সুদীর্ঘ ৩৪ বছর ধরিয়া লাঞ্ছিত অত্যাচারিত হইয়া দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়া যাইবার পর অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তন চাহিয়াছিল। মানুষের সমবেত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক পরিবর্তন আসিলেও ক্ষমতার জাহির করিবার প্রবণতার পরিবর্তন হয় নাই। পতাকার রঙ পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র, অত্যাচার লাঞ্ছনার রঙ বদল হয় নাই। বস্তুত বামফ্রন্ট যেইখানে শেষ করিয়া গিয়াছে তৃণমূল সরকার সেইখান হইতেই শুরু করিয়াছে মাত্র। যেইসব হাড়হিম করা ঘটনা ঘটাইতে বামফ্রন্টের ৩৪ বছর সময় লাগিয়াছিল, সেইসব ঘটনা তিন বছরের মধ্যে আরও বীভৎসরূপে ঘটিয়া চলিতেছে। কামদুনি, কাটোয়া, মধ্যমগ্রাম, গেদে নারীনির্যাতনের কদর্যরূপ বন্ধ হয় নাই। খরবোনা, পাড়ুই, সিউড়ি, লাভপুর, বালি, বামুনগাছিতে যেভাবে প্রতিবাদীদের হত্যা করা হইল তাহা দেখিয়া বঙ্গবাসী ভাবিতেছে পরিবর্তনের পরিণাম। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় পরিবর্তনের সরকারের কাণ্ডারীর আচার-আচরণ, ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার, ভাষা প্রয়োগ, সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অমর্যাদা, সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয়, প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে দলীয় কাজে ব্যবহার, বিরোধীদের হুমকি, গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষদৃষ্টি প্রভৃতি কার্যকলাপ। ন্যায়ের শাসনের সেই অঙ্গীকার আজ কোথায়? সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন যেমন রাজ্যকে রাজনৈতিক ভাবে এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড় করাইয়াছিল আজও সেই একই ভাবে তৃণমূল রাজত্বে কামদুনি সুঁটিয়া বামনগাছি মধ্যমগ্রাম হিঙ্গলগঞ্জে ঘটে যাওয়া একের পর এক নারকীয় ঘটনা এবং তাহাকে ধামাচাপা দিতে গিয়া প্রতিবাদী আন্দোলনকে দুরমুশ করিয়া স্তব্ধ করিয়া দিবার তৃণমূলী প্রচেষ্টা রাজ্যবাসীকে পুনরায় পালাবদলের সন্ধিক্ষণের দিকে লইয়া যাইতেছে।

রাজনৈতিক পালাবদলে যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই তাহা আজ সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি হইতেছে। শিক্ষায় দলবাজি আজ বন্ধ হইয়াছে কি? শিক্ষায় অনিলায়ন ছিল আজ মমতায়ন হইয়াছে মাত্র। আজ শিক্ষাক্ষেত্র শুধু বিপন্ন নয় শিক্ষাঙ্গন আজ শাসক দলের প্রশ্রয়ে তোলাবাজির আখড়া হইয়া উঠিয়াছে। পরিতাপের বিষয় হইল বামরাজত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরাজকতার প্রতিবাদে বিদ্বজ্জনেরা কিছুটা হইলেও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আজ সব মার্গের বিদ্বজ্জনেরা মুখে কুলুপ আঁটিয়াছেন। নিন্দুকেরা বলিতেছেন তাঁহারা সবাই দিদির প্রসাদে ধন্য হইয়া গোলামে পরিণত হইয়াছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দেখভাল করিয়া থাকেন, কিন্তু রাজ্যের স্বাস্থ্যের হাল যে কি তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। এই রাজ্যে পুলিশের রাজনীতিকরণ ঘটিয়াছিল বামফ্রন্ট আমলেই। তখন দলীয় ক্যাডার ও পুলিশের মধ্যে পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল হইত। কিন্তু পরিবর্তনের এই সরকারের আমলে পুলিশের তৃণমূলীকরণ ঘটিয়াছে আরও বেশি অর্থাৎ যে কাজ শুরু করিয়া গিয়াছিল বামফ্রন্ট সেই কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছে বামফ্রন্টের সফল উত্তরাধিকারী তৃণমূল সরকার। সুদীর্ঘ বামরাজত্বে যে অবক্ষয় শুরু হইয়াছিল তাহা আজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। তৃণমূলের সৌজন্যে রাজ্যে যে হারে মুসলমান দাপট শুরু হইয়াছে তাহাতে অচিরেই বাঙালির সংস্কৃতি ইতিহাস, মূল্যবোধ লুপ্ত হইবার অপেক্ষায়।

মুসলমান আধিপত্য এবং পশ্চিমী ভোগবাদের দাপটে বাঙালির পারিবারিক রক্ষণশীলতা ও মূল্যবোধ আজ শূন্যে পরিণত প্রায়। পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়াছে। স্নেহ-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মূল্যবোধ প্রভৃতি শব্দগুলিও লুপ্ত হইবার পথে। সজ্জনশক্তি জাগরিত না হইলে পশ্চিমবঙ্গের সম্মান আজ বাঁচাইবে কে? শাসক দলের অন্যায় কাজ করিয়াও 'বেশ করিয়াছি' মনোভাব বন্ধ করিবার জন্যই সজ্জন শক্তির জাগরণ প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে। এই রাজ্যে বিরোধীদল কংগ্রেস লুপ্তপ্রায়, বামফ্রন্ট নিজের পাপেই সাইনবোর্ড সর্বস্ব আর বিজেপি সঠিক নেতৃত্বের অভাবে দিশেহারা। তাই শাসকদলের এত অপকর্ম। পরিবর্তনের সুফল মিলিল না মানুষের সচেতনতার অভাবে।

সুভাষিত

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।।

অসৎ ব্যক্তির বিদ্যা বিতর্ক করার জন্য, ধন মদমত্ত হওয়ার জন্য এবং শক্তি অপরকে পীড়ন করার জন্য। কিন্তু এর বিপরীতে— সৎ ব্যক্তির জ্ঞান ও ধন দান করার জন্য এবং শক্তি অপরকে রক্ষা করার জন্য।

সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রীভাগবত
রাষ্ট্রদীপের গুরুত্ব তার ভাবনার জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোনো সংবাদপত্রের গুরুত্ব তার প্রচার সংখ্যার জন্য নয়, তার ভাবনার জন্য। ওড়িয়া সংবাদ সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রদীপ' গত ৫০ বছর ধরে ভাবনার এই মহত্ত্বের জন্যই চলছে। —গত ১০ আগস্ট, রবিবার, সন্ধ্যায় কটক শহীদ স্মৃতি প্রেক্ষাগৃহে রাষ্ট্রদীপ পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এই কথাগুলি বলেন। তিনি আরও বলেন, সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'নিউজ' নয়, 'ভিউজ'-এরই প্রাধান্য। জনগণকে সচেতন করাই এর লক্ষ্য। সমাজ সচেতন বা জাগ্রত হলেই দেশের কল্যাণ হবে। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস এই জনজাগরণেরই ইতিহাস। এখন অবশ্য টি আর পি বাড়ানো অর্থাৎ মুনাফা অর্জনই সাংবাদিকতার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পত্রিকাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। তাদের কাছে এই লাভই হচ্ছে ধর্ম। অন্যদিকে সমাজের মধ্যে ভেদভাব, স্বার্থপরতা রয়েছে তা দূর করে পরার্থে কাজ করার মানসিকতা নির্মাণই হলো ধর্ম। এই কাজ করতে গেলে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে, প্রচার-প্রসার কমে যাবে কিন্তু সম্পাদককে পালালে চলবে না। বেশ কঠিন কাজ, তবু করতে হবে, কেননা তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। তাই রাষ্ট্রদীপের দশা বদলালেও দিশা বদলাবে না।এই দিনের অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহ আক্ষরিক অর্থেই ছিল পরিপূর্ণ। কটকের বহু বিদ্বজ্জনের উপস্থিতি এই সভাকে একটি অন্য মাত্রা এনে দেয়। রাষ্ট্রদীপ-এর চলার পথে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁদের কয়েকজনকে, যেমন শতায়ু ভূপেন বসু, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও লেখক হরিহর নন্দকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বর্ষব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তীর এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অচ্যুত সামন্ত। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতকে 'রাষ্ট্রীয় বিবেক নির্মাতা' হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, আর এস এস 'ট্রাডিশনাল মাইন্ড সেট'-কে নতুন দিশা দেখাচ্ছে— যুগানুকূল করার চেষ্টা করছে।

সংস্কার ভারতীর সদস্যদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভার শুরুতে সম্পাদক জগবন্ধু মিশ্র সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিশিষ্ট অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন। রাখি পূর্ণিমার দিনে এই অনুষ্ঠান ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও একাত্মতার আনন্দে মুখর হয়ে উঠে।

পশ্চিমবঙ্গের অষ্টমশ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্য বইয়ে ক্ষুদিরাম ও চাকী সন্ত্রাসবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে 'চরমপন্থী' ও 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অষ্টমশ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে উল্লেখ করায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাসের এই অন্যায়ের শিরোনাম— 'বিপ্লবী আতঙ্কবাদ'। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী বলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সমগ্র জাতিকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অবিলম্বে পাঠ্যসূচির এই অংশটি সংশোধন করে দোষী সরকারি অফিসারদের শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে রাজ্যের সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। দেশকে স্বাধীন করার জন্য ক্ষুদিরাম ও

কানাইলাল দত্ত

ক্ষুদিরাম বসু

প্রফুল্ল চাকীদের বিপ্লবী কাজকর্মকে আতঙ্কবাদ বলে বর্ণনা করা হলে তা নবীন প্রজন্মের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্ষুদিরামের যখন মাত্র ১৮ বছর বয়স, ১৯০৮ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। প্রফুল্ল চাকী বৃটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নিজের রিভলবার দিয়েই আত্মহত্যা করেন। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁদের এই আত্মোৎসর্গ দেশবাসী এখন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। তাঁদের নামে এদেশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে স্কুল, কলেজ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই এই কাজ যারা করেছে, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করেছে। তাদের অবিলম্বে শাস্তি হওয়া দরকার বলে মনে করেন রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই।

দেশবাসী চেয়েছিলেন বলেই ক্ষমতায় পরিবর্তন : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র অভাবনীয় সাফল্যকে মানুষের জয় বলে অভিহিত করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। গত ১০ আগস্ট সকালে রাখিবন্ধন উপলক্ষে ভুবনেশ্বরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে মোহনজী বলেন, মানুষ পরিবর্তন চেয়েছেন বলেই বিজেপি এই বিপুল জয়ের মুখ দেখেছে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি-র সাফল্যের পর কোনো কোনো মহল থেকে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে, এই সাফল্য এসেছে দলের জন্য। আবার কোনো মহলের বক্তব্য যে এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষ। কিন্তু এই দল বা ব্যক্তিরা তো আগেও ছিলেন কিন্তু তখন তাঁরা নির্বাচনে জিততে পারেনি কেন? তাই মোহন ভাগবতের সিদ্ধান্ত এই জয়ের পেছনে মানুষের যে অবিসংবাদিত ভূমিকা রয়েছে তাকে সর্বাগ্রে স্বীকার করে নিতে হবে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, দল কিংবা ব্যক্তির উর্ধ্বে যে দেশবাসী ও তাদের মর্যাদা, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরে ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তাধারাকেই মান্যতা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক। একইসঙ্গে এদেশে রাজনীতির চেয়ে ধর্মনীতি যে ভারতবাসীর কাছে বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে তাও স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি। যদিও তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরে সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ রীতিমতো বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। মোহনজী বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কারুর নাম না নিলেও একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম তাদের কল্পিত নামগুলি তাঁর মুখে বসিয়ে দিতে চাইছে।

অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের সনাতন আধ্যাত্মিকতা রক্ষায় দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন শ্রীভাগবত। তাঁর বক্তব্য, আমাদের দৈনন্দিন দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া জীবনে সনাতন ঐতিহ্যের গুরুত্ব কমে আসছে। কিন্তু তার ঐতিহ্য রক্ষা করতে না পারলে কোনো জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তাই সনাতন ঐতিহ্যভিত্তিক আমাদের নতুন জীবন শুরু করতে হবে।

শোকসংবাদ

গত ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া শাখার শিশু স্বয়ংসেবক গৌরাঙ্গ সিংহবাবু বজ্রাঘাতে পরলোকগমন করে। বয়স হয়েছিল মাত্র ৯ বছর। গৌরাঙ্গ বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান ছিল। তার মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিশেষ আবেদন

স্বস্তিকার আগামী ২২শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যাটি পূজা সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের গ্রাহকমেয়াদ ২২শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে শেষ হচ্ছে তাঁদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহকপদ আগামী ২২শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে নবীকরণ করান, যাতে আপনার পূজা সংখ্যাটি সময়মতো পাঠানো সম্ভব হয়।

—ব্যবস্থাপক

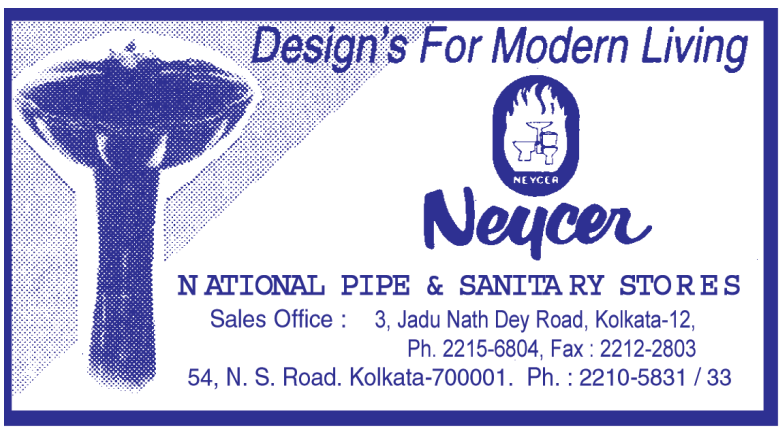

দেশের স্পর্শকাতর বিষয়গুলি সমাধানে উদ্যোগী মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের স্পর্শকাতর বিষয়গুলির দ্রুত সমাধানের ব্যাপারে উদ্যোগী হলো মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ। আপাতত তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত স্পর্শকাতর বিষয়গুলি সমাধানেই গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মঞ্চের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের ভারপ্রাপ্ত ইন্দ্রেশকুমার জানিয়েছেন শীঘ্রই পাঁচটি কর্মগোষ্ঠী গঠন করা হবে যারা মুসলমান সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করবেন। যার মধ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলন, সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি রয়েছে। ইন্দ্রেশজী জনিয়েছেন এই কর্মগোষ্ঠীগুলি হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমান পণ্ডিত, লেখক, বুদ্ধিজীবি ও আধিকারিকদের সঙ্গে মিলিত হবে ওই বিষয়গুলি নিয়ে। ইন্দ্রেশ কুমার গত ১০ আগস্ট মুসলমান রমণীদের সঙ্গে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং ওই অনুষ্ঠান থেকে খৃস্টানদের উদ্দেশ্যেও তাতে

যোগ দেওয়ার বার্তা দেন। প্রসঙ্গত, মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব সক্রিয় করতে বহু বছর ধরেই ইন্দ্রেশ কুমার ও তাঁর মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ সক্রিয়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে এতেই রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক লোভী রাজনৈতিক দলগুলি মঞ্চের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ সংহত করেছে।

উত্তরপ্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারাও গোপনে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে স্বয়ং ইন্দ্রেশজী যেভাবে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন, এমনকী রুদ্ধদ্বার বৈঠক পর্যন্ত করছেন তাতে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের গাফিলতি অনেকটাই ঢেকে যাচ্ছে। এবং এই সংঘর্ষের মদতদাতা একশ্রেণীর মুসলমান ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক কারবারীরাও ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে ইন্দ্রেশজীর স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায় বারাণসীতে মাসাধিককাল ব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার প্রতিফলন এবার ভোটবাক্সে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর কৌশলের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রীকুমার জানিয়েছেন, প্রথম কর্মগোষ্ঠী অযোধ্যা, কাশী এবং মথুরার ধর্মস্থানের ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলবে। তাঁর বক্তব্য, কিছু ধর্মান্ধ মুসলমান নেতা ও ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা এধরনের আলোচনার বিপক্ষে লাগাতার বাধা দিয়ে গেলেও জাতীয়তাবাদী ও উদার মানসিকতার মুসলমানদের কাছ থেকে ভালোই সাড়া পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় কর্মগোষ্ঠী অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ওপর কাজ করবে সম্প্রদায়গত জাত-পাত ও উপাসনা-পদ্ধতি নির্বিশেষে দেশের অভ্যন্তরীণ আইনি কাঠামোকে কোনোভাবে বিব্রত না করে। ইন্দ্রেশজীর বক্তব্য : 'সম্প্রদায়গুলির পরম্পরাগত নির্দেশনামার কোনোরকম ক্ষতি করতে আমরা চাই না। কিন্তু সার্বিকভাবে একটা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরি হওয়া দরকার এই কারণেই যদি সমস্যাটা দুই সম্প্রদায় বা দু'জাতের মধ্যে হয়। এই পরিস্থিতিতে দেশের আইন যাতে সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে সেই কারণেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি জরুরি।

দিল্লী পুলিশে মহিলাকর্মীর সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ খোদ রাজধানীর বুকে মহিলা সুরক্ষায় অভিনব উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন দিল্লী পুলিশে মহিলাকর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে মোট পুলিশ কর্মী সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ করা হবে। গত ৬ আগস্ট সংসদে দাঁড়িয়ে একথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজ্যপুলিশ ও কেন্দ্রীয় পুলিশ ফোর্সেও মহিলা পুলিশের সংখ্যা মোট পুলিশকর্মীর এক-তৃতীয়াংশ করার দিকে এগোবে কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে, দিল্লীতে একের পর এক ঘটনায় যেভাবে মহিলাদের ওপর অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে সার্বিকভাবে মহিলাদের নিরাপত্তাই আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে। পুরুষ পুলিশকর্মীর কাছে তাঁরা যতটা না স্বচ্ছন্দ হবেন তার থেকে অনেক বেশি আন্তরিক হবেন মহিলা পুলিশকর্মীর কাছে। মহিলাদের ভরসা যোগাতেই তাই প্রাথমিকভাবে মহিলা পুলিশকর্মী ব্যাপকভাবে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টিও যে কেন্দ্রের মাথায় রয়েছে, রাজনাথের ঘোষণা থেকে তা স্পষ্ট বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত।

ভারতের নতুন সেনাপ্রধান দলবীর সিং সুহাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সিয়াচেন যাওয়ার আগে সেখানে গিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন জেনারেল দলবীর সিং সুহাগ। ২৬ তম সেনাপতি হিসাবে সম্প্রতি তিনি জেনারেল বিক্রম সিং-এর হাত থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হরিয়ানার এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে।

হরিয়ানার ঝাঝর জেলার বিষান গ্রামে ২৮ ডিসেম্বর ১৯৫৪-তে তাঁর জন্ম। গ্রামের অনেকের মতোই তাঁর বাবা ও কাকা সেনাবাহিনীর পদাতিক বিভাগে কাজ করতেন। দলবীরও বাবা- কাকাদের মতো গ্রামের ছোট প্রাইমারি স্কুলে তার শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে এই শিশুই একদিন দেশের সেনাপ্রধান হবে।

প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে, দলবীর ও তার বন্ধুরা গাছের তলায় বসেই লেখাপড়া শিখেছেন। অবসর সময়ে দলবীর চাষআবাদের কাজে তাঁর পরিবারকেও সহায়তা করতেন। মাঠে চাষ করতে গিয়ে

তাঁর মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, কেননা এই মা-টিই তাঁদের আহার যোগায়। ১৯৬১ সালে সরকার সারাদেশ জুড়ে সৈনিক স্কুল স্থাপন করে। রাজস্থানের চিতোরেও এরকম একটি সৈনিক স্কুল হয়েছিল।

জেনারেল সিং-এর দাদু এই স্কুলের একজন ইনস্ট্রাকটর ছিলেন। তিনিই দলবীরকে এই স্কুলে পড়ার প্রস্তাব দেন এবং সেই মতো দলবীর ১৯৬৫-র ১৫ জানুয়ারি এই স্কুলে ভর্তি হন।

ছাত্রের এই পদোন্নতিতে তাঁর নব্বই বছর বয়স্ক শিক্ষক কে এস খাং আবেগাপ্লুত হয়ে বলেছেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমার বয়স এখন আঠারো।' এইচ এস রাঠি নামে আর একজন শিক্ষক দলবীরের সম্পর্কে বলেছেন, নিজের কাজের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন, কঠোর পরিশ্রমী ও অনুগত ছাত্র। সে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও বেশ দক্ষ, বিশেষত বাস্কেটবল খেলায়। স্কুলে তাঁর ইংরেজির শিক্ষক জে এন ভার্গব বলেছেন, দলবীর পড়াশোনাটা ঠিকমতো করতো। কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়চেতা। কাজে লেগে থাকার ধৈর্য তার ছিল। কোনো কাজের দায়িত্ব দিলে সে অত্যন্ত অনুগত হয়েই তা করত। জেঃ সুহাস এরপর ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি (এনডিএ)-তে যোগ দেন এবং ১৯৭৪ সালে ৫নং গোর্খা রাইফেলস-এর ৪নং ব্যাটেলিয়নে (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে ফিল্ড মার্শাল হিসেবে শ্যাম মানেকশ নিযুক্ত হওয়ার পর তিনিই প্রথম সেনাপ্রধান যিনি নিজেও সেই গোর্খা রেজিমেন্টরই জওয়ান।

উত্তরপ্রদেশে লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ধর্মজাগরণ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরপ্রদেশে লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রচারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ধর্মজাগরণ মঞ্চ। গত ১০ আগস্ট সকালে রাখিবন্ধনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় মঞ্চের কর্মকর্তারা লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ নেন। প্রসঙ্গত, হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত করেছে একদল মুসলমান যুবক।

মূলত হিন্দু রমণীদের দেশবিরোধী কাজে লাগাতে এবং সমাজে অস্থিরতা তৈরিতে পরিকল্পনামাফিক এই কর্মে মদত যোগাচ্ছে মুসলমান ধর্মগুরুরা। এই লাভ জেহাদ' বন্ধে আবেদন করার সময় বিশেষ করে হিন্দু বালিকা, যুবতী, তরুণীদের রাখিবন্ধনে জোর দেন মঞ্চের কর্মকর্তারা। তাঁরা আবেদন করেন কোনো মুসলমান যুবক বা তরুণের পাতা ফাঁদে যেন এঁরা পা না দেন। যা আদতে এঁদের মুসলমান ধর্মান্তকরণ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নয়। এই সরল সত্যটা বোঝানোর পাশাপাশি ওই হিন্দু তরুণী- যুবতীদের অভিভাবকদেরও এনিয়ে সতর্ক থাকতে বলেন মঞ্চের কর্মকর্তারা।

হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ ঠেকাতে বেশ কয়েকবছর ধরেই তৎপর এই হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। দারিদ্র বা অন্য কোনো পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চার্চ বা মসজিদ এককালে যাদের ধর্মান্তরকরণ ঘটিয়ে খৃস্টান বা মুসলমান করেছিল তাদের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়ে জীবিকার সুযোগ করিয়ে দিতেও সক্রিয় এই মঞ্চ। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এই দেশভক্ত ভূমিকা আজ তাই সর্বস্তরে প্রশংসনীয়। 'লাভ জেহাদ' বিষয়টি যদিও বেশ পুরোনো কিন্তু হিন্দুজাগরণ মঞ্চের এ নিয়ে সক্রিয়তা এই প্রথমবার।

মঞ্চের পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের প্রধান রাজেশ্বর সিং জানিয়েছেন, গত ১০ আগস্ট 'লাভ জেহাদে'র বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে তা লাগাতার চালিয়ে গেলেও ১৭ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিনের মধ্যে অন্তত দশ লক্ষ হিন্দুর হাতে রাখি পরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মঞ্চ। উত্তর-প্রদেশের সঙ্গে সারাদেশেও একই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এক সপ্তাহে অন্তত একশ' জনের হাতে রাখি পরানোর ব্যক্তিগত লক্ষ্যমাত্রা কার্যকর্তাদের জন্য ধার্য করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সংবাদমাধ্যমে ভোটলুট দেখেও কমিশনের পর্যবেক্ষকরা চোখ বন্ধ করে থাকেন

দেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বড় গলদটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা। নির্বাচনের আগে অবাধ ও শান্তিপ্রিয় ভোট করার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দেয় কমিশন। সারাদিন পদস্থ আমলারা ব্যস্ত থাকেন মিটিং এর পর মিটিং করতে। ভোটের দিন যাতে কোনোভাবেই আইন শৃঙ্খলা নষ্ট না হয় তাই নিয়ে চলে রাজ্য সরকারের আমলাদের সঙ্গে চাপান উতোর। বিস্তর জলঘোলা হয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে প্রতিটি বুথে সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। কমিশনের পর্যবেক্ষকরা ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর। বাস্তবে এসব কিছুই হয় না। হয়তো বলবেন পশ্চিমবঙ্গে হয় না। অন্য রাজ্যে এমন অরাজকতা হয় না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এমন ধারণা ভুল। ভারতের সব রাজ্যেই বাড়তি সুবিধা পায় শাসকদল। ভারতের নির্বাচন কমিশনের হাতে বিপুল সাংবিধানিক ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা ব্যবহারের যোগ্যতাই নেই। অথবা শাসকদলের সঙ্গে আপোস করে নির্বাচনটা উতরে দিতে পারলেই কর্তব্য শেষ। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় যখন বুথে ভোট লুঠের ছবি দেখা যায় তখন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা চোখ বন্ধ করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গেই লোকসভার ভোট চলাকালে এমন দৃশ্য টিভিতে সকলেই দেখেছেন। শুধু নির্বাচন কমিশনের মাতব্বররা দেখতে পাননি। শাসকদলের ভোট লুঠ বন্ধ করতে কমিশন ইচ্ছা করলে শুধু সেই বুথ নয়, সেই কেন্দ্রেরই ভোট বাতিল করতে পারে। এতে লুঠেরারা কিছুটা সংযত হবে। এমনকী সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে একই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু কমিশন যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না। এই সহজ সরল কথাটি দেশের সব রাজনৈতিক দলই বুঝে গেছে। মুশকিলটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন স্বশাসিত স্বাধীন সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না। ভোটে রিগিং বন্ধ করার ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে দেশের এই সাংবিধানিক সংস্থার কর্তারা তাই পার পেয়ে যাচ্ছেন।

যেহেতু নির্বাচন কমিশন ভোটে রিগিং বন্ধ করতে ব্যর্থ এবং কমিশনের সাংবিধানিক রক্ষা কবচ থাকায় বিরোধী দলগুলির প্রার্থীরাই সবচেয়ে বিপদে পড়েন। তাই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ তাঁর দলের রাজ্য সভাপতিদের বুথরক্ষা বাহিনী তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রথম দেশের প্রধান জাতীয় দলের সভাপতি নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতাটা সঠিকভাবে বুঝেছেন এবং দলকে আগাম সতর্ক করেছেন। নিজের ঘর নিজেরা রক্ষা না করলে অন্যারা রক্ষা করবে এমন আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখার দিন শেষ। আত্মরক্ষা মানুষের সহজাত ধর্ম। মার খেয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার কথা বলছি না। বুথ রক্ষা করে

গূঢ়পুরুষের

কলম

ভোট লুঠ রুখতেই তৈরি হোতে হবে। না পারলে মিডিয়ার সামনে দয়া করে মায়া কান্নাটা অন্তত বন্ধ রাখুন। মার খেলে পাল্টা মার দেওয়াটাই আত্মরক্ষা। অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যদি ধর্মরক্ষায় প্রাণ যায় তো ক্ষতি নেই। দেশের সব রাজ্যেই ভোট লুঠ এখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

দেশের চারটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন। এই চারটি রাজ্য হচ্ছে, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর এবং ঝাড়খণ্ড। এছাড়াও বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভার আসনে উপনির্বাচন হবে। উপনির্বাচনকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। ভুললে চলবে না যে উত্তরাখণ্ড রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি নিজেদের দখলে থাকা দুটি আসনে শাসকদল কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হয়েছে। অথচ মাত্র কয়েকমাস আগে এই দুটি আসনে বিজয়ী দুই বিধায়ক লোকসভার ভোটে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছেন। তারপরেও এমন অঘটন ঘটেছে কারণ ভোট লুঠ রুখতে দলের ব্যর্থতা। প্রশ্ন করাই যেতে পারে যে মোদী লহরের জেরে লোকসভার ভোটে চমকপ্রদ সাফল্য আসায় দলীয় নেতৃত্ব আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছিলেন। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন সহজেই দলীয় প্রার্থীরা জিতবেন। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, উত্তরাখণ্ড বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি একটি আসনেও জিততে পারেনি। তবে এটা মন্দের ভাল। একটা ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। যে চারটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন তার মধ্যে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে বিজেপি শক্তিশালী। সঠিক নীতি অনুসরণ করলে হরিয়ানাতেও পদ্মফুল না ফোটার কারণ নেই। জম্মুতে বিজেপির ভিত মজবুত হলেও ধর্মীয় কারণে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রভাব নেই। এমন অবস্থা হোত না যদি হিন্দু পণ্ডিতদের গণ বিতাড়ন রুখে দেওয়া যেত। আমরা হিন্দুরাই শান্তির বুলি আওড়ে তখন নীরব থেকেছি। কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল সারা ভারতের সমস্ত হিন্দুর। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি। আজ কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু পণ্ডিতরা বাস করতেন তা হলে সেখানে ইসলামের নামে জেহাদি তাণ্ডব লাগাম ছাড়া হতে পারতো না। কেন্দ্রের মোদী সরকারের কাছে আমরা আশা রাখতে পারি যে পণ্ডিতদের নিজ বাসভূমিতে বসবাসের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সারা দেশের হিন্দু সমাজ দু'হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করবে। চারটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে তিনটি রাজ্যে এন ডি এ জয়ী হলে বোঝা যাবে মোদী লহরের তেজ অক্ষুণ্ণ আছে। অমিত শাহ সঠিকভাবেই বলেছেন, নির্বাচনে জয়কে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

প্রতিটি নির্বাচনকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। যে রাজ্যেই নির্বাচন বা উপনির্বাচন হোক না কেন, দলের সমস্ত সাংসদ মন্ত্রীকে নিয়মিতভাবে নির্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। কোনো অজুহাত বরদাস্ত করা হবে না। দলীয় শৃঙ্খলাকে সামরিক শৃঙ্খলায় উন্নত করতে হবে। আমি কেন্দ্রীয় ওজনদার মন্ত্রী, আমি সাংসদ, তাই পাঁচ বছর আয়েশ করে কাটিয়ে দেব এমন মনোভাব থাকলে মোদী লহর কোনো কাজেই আসবে না। মনে রাখতে হবে বাড়িতে চুরি রুখতে গৃহস্থকেই সতর্ক থাকতে হয়।

রতন টাটা, বড্ড ঠ্যাটা

মাননীয় রতন টাটা
চেয়ারম্যান এমেরিটাস, টাটা গোষ্ঠী
কোলাবা, মুম্বই

প্রিয় টাটাবাবু,

সম্বোধনটা পছন্দ না হলে মাফ করবেন। আমার দিদিভাই আপনাকে এই নামেই ডাকেন বলে আমিও সেটাকেই বেছে নিলাম। আমি দিদির ভাই। তাই অন্য ভাইদের মতো আমিও মনে করি, রতন টাটার মতিভ্রম হয়েছে, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আপনি কলকাতাকে গ্রাম দেখলেন। রাজ্যে শিল্প দেখলেন না। এটা কখনওই ঠিক হয়নি। অন্য অনেক পরামর্শ পেয়েছেন, তবু আমি একটা নতুন পরামর্শ দিচ্ছি। দয়া করে আপনার দেখার চোখটা বদলান। তাহলেই সব ভালো চোখে পড়বে। খারাপ দেখার অভ্যাসটা চলে যাবে। মাথাও কাজ করবে। মতিভ্রম ঘুচে যাবে। হতে পারে কলকাতা শহরে শুয়োর ঘুরে বেড়ায়, রাস্তায় জল কাদা জমে তবু কলকাতা যে এক উন্নত শহর, কলকাতা যে নীল সাদা সুনগরী তা বুঝতে পারবেন দেখার চোখটা বদলে ফেললে। আপনি রাজ্যে শিল্প দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তখন বুঝতে পারবেন বাড়ি তৈরিও এক শিল্প। প্রোমোটাররাও শিল্পপতি। আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, কলকারখানা না হলেও সরকারের ফাইলে অনেক অনেক প্রস্তাব জমা পড়ে আছে। তোলাবাজি শিল্পের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরেই তারা প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে ভয় পাচ্ছে। এই ভয় ব্যবসায়ীর। কম্পিটিশনকে ভয় পাচ্ছে। তোলাবাজির শিল্পের পাল্লা দিতে না পারাটা তাদের ব্যর্থতা, সরকারের নয়। আপনি সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা করতে পারলেন না এটা আপনার ব্যর্থতা। রাজ্য সরকারের নয়। অমিত দাদা, ফিরহাদ দাদা, পার্থ দাদারা আপনাকে গালাগাল দিয়ে ঠিক করেছেন।

তাই বলছি আপনার দেখার চোখটা বদলান। তবে শিল্প বলতে কী বোঝায় সেটা বুঝতে পারবেন। দিদির বাণী মন দিয়ে পড়ুন। তবেই বুঝবেন শিল্প কাকে বলে। বছর দুয়েক আগে এক সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে ‘শিল্প’-এর সংজ্ঞা ঠিক করে দিয়েছিলেন আমাদের সবার দিদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, ‘‘শুধু কি কাঠের শিল্প, সিমেন্টের শিল্প, লোহার শিল্পই শিল্প?’’ স্পষ্ট ভাষায় তার উত্তর দিয়ে দিদি বলেছিলেন, যাত্রা-নাটক-সিনেমা-সঙ্গীত সবই শিল্প এবং সেই শিল্পকেই তিনি বেশি করে তুলে ধরবেন।

যেমন ভাবা তেমন কাজই করে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পমহলের মন টানতে সময় নষ্ট না করে তিনি সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন, কাটাচ্ছেন। লোকসভা নির্বাচনেও রাজনীতিকদের সরিয়ে রেখে একসে বড়কর এক ফিল্মি দুনিয়ার মানুষকে ভোটে দাঁড় করিয়ে জিতিয়ে এনেছেন। এই যেমন আপনি যখন রাজ্যের শিল্প-ছবির সমালোচনা করলেন তখন দিদি শুধু শুধু মন্তব্য করে সময় নষ্ট করেননি। শান্তিপুরের সমাবেশে শুধু বলেছেন, কেউ কেউ রাজ্যে শিল্প দেখতে পাচ্ছেন না। শুক্রবার মানে ৮ আগস্ট সেই মন্তব্য করার পরদিন ৯ আগস্ট শনিবার তাঁর শিল্প নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছেন। সেদিন সন্ধ্যায় কলকাতা পুলিশের অনুষ্ঠান মঞ্চে দিদির পাশে কখনও শাহরুখ খান, কখনও বিপাশা বসু, কখনও দেব, কখনও জিৎ, রচনার মতো টালিগঞ্জের প্রতিনিধিরা। মহিলা পুলিশকর্মী যখন শাহরুখ খানের কণ্ঠলগ্না হয়ে নেচেছেন তখন তিনি তা উপভোগ করেছেন একেবারে সামনের সারিতে বসে। প্রশাসন ও শিল্পের এমন সহাবস্থানের ছবি রতনবাবু কোথাও কখনও দেখেছেন কি? দেখার চোখটা বদলান, তবেই এই শিল্প দেখে আপনি পজেটিভ কিছু খুঁজে পাবেন। এটাকে যাঁর সংস্কৃতিপ্রেম বলছেন তাদের বলুন এটা আসলে শিল্পপ্রেম।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সামনের সারিতে বসে ‘কলকাতার রসগোল্লা’ নাচ দেখা, ব্রিগেডের মঞ্চে অধুনা সাংসদ দেবের ‘পাগলু থোড়া সা কর লে রোমান্স’ নাচে হাততালি দেওয়া সবই শিল্পের স্বার্থে। সেই স্বার্থেই সিনেমা আর্টিস্টদের বাড়িতে বিয়ে, গৃহপ্রবেশ কিংবা লক্ষ্মীপুজো, সন্তোষী মায়ের পুজোয় তিনি নিয়মিত যান। একটা বিষয় মানবেন তো যে এই সব জায়গায় দিদির সমালোচনা করার কেউ নেই। আপনার মতো কপাল কুঁচকনোর কেউ নেই। সেখানে শুধুই প্রশস্তি।

গত বছরেই কলকাতার টাউন হলে সিআইআই শিল্প সম্মেলন ডেকেছিল। সেখানে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু তার থেকে বড় শিল্পের দাবিদার সুচিত্রা সেন সেদিনই প্রয়াত হন। তাই দিদি প্রধান কর্তব্য হিসেবে মায়ের অন্ত্যেষ্টিতে মেয়ে অধুনা সাংসদ মুনমুনকে সঙ্গ দিয়েছিলেন দিনভর। মহানায়িকার গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব পালন, আসলে শিল্পের প্রতি দায়িত্ব পালন। সেদিন শিল্পপতিদের বৈঠকে কী বা করতেন তিনি। বক্তব্য রাখতেন। সেটা অমিত মিত্র টেলিফোন মারফত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু টেলিফোনে সুচিত্রা সেনের মুখাগ্নি কিংবা তাঁর নামে রাস্তার ঘোষণা সম্ভব ছিল না।

তাই আবারও বলছি, দেখার চোখটা বদলান টাটাবাবু। অমিত মিত্র যা বলেছেন সেটাই করুন। এরোপ্লেন ওড়ানোর শখ মেটান। এই রাজ্যের শিল্প নিয়ে ভাবার অনেক লোক আছে।

— **সুন্দর মৌলিক**

ধর্ম রক্ষায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য

শ্রীমদভগবদ্গীতায় ভগবান কথা দিয়েছেন— ‘‘পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।’’ যুগে যুগে তিনি আসেন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম সংস্থাপন ও রক্ষার জন্য। এই ধর্ম আমাদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি যা মানব ধর্মও বটে। এই ধর্ম রক্ষা না হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না এবং এই ধর্মের অভাবে সৃষ্টি হয় উৎপীড়ন। অবতার আসেন মনুষ্যরূপে ঐশী শক্তিতে ঐশ্বর্যবান হয়ে। বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যেভাবে সনাতন সংস্কৃতির পরিত্রাতার ভূমিকায় সদাসর্বদা নিযুক্ত আছে তাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সঙ্ঘের সত্তা পরিপুষ্ট হয়েছে ঈশ্বরীয় শক্তিতে। সেইজন্য আজ হাজার হাজার স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্মকে ঈশ্বরীয় কর্ম বলে মেনে আসমুদ্রহিমাচল সমাজসেবা ও সনাতন সংস্কৃতি রক্ষার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল তা ছিল শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা। হাজার বছরের পরাধীনতা ও মর্মান্তিক নিপীড়ন সহ্য করার পর হিন্দুরা ভেবেছিল এই স্বাধীনতা তাদের মানুষের মতো বাঁচার অধিকার ও সুযোগ দেবে। কিন্তু তা হলো না। নেতৃত্বের শিখরে যাঁরা বসলেন তাঁদের ভাবনাচিন্তায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য বিশেষ কিছু ছিল না। দেশ শাসনের জন্য একটা সংবিধান তৈরি হলো যেখানে সংখ্যালঘুদের জন্য নানাবিধ সুযোগ সুবিধা থাকল, কিন্তু ওই সব সুযোগ থেকে হিন্দুরা হলেন বঞ্চিত। ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো হতে থাকল সমাজকে ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ড বিখণ্ড করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আইনের বেড়াজালে বাঁধা হলো Hindu marriage Act, Hindu Suceession Act, Hindu Religious Act ইত্যাদির দ্বারা। সংখ্যালঘুরা এসব আইনের ঊর্ধ্বে থেকে গেলেন। ‘হিন্দু’ নামটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছল যে ওই শব্দ উচ্চারণমাত্রই যে-কোনো ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক তকমায় ভূষিত হবেন আর হিন্দু বিরোধী হলে তিনি প্রগতিশীল আখ্যা পাবেন। দেখা গেল সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে Secular বা Socialist/Communist হতে হবে। বিগত ৬০ বছর ধরে জয়জয়কার হয়েছে Secularist, Communist, Islamist এবং মিশনারিদের। হিন্দুসংস্কৃতির প্রতিনিধিরা হয়েছেন অপাঙক্তেয়। এর ফলে ভোটদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা হয়েছেন বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং শতধাবিভক্ত। আর সংখ্যালঘু মুসলমানরা একত্র হয়ে ব্লকভোটের অস্ত্রে হয়েছেন নির্ণায়ক শক্তি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কথঞ্চিৎ ঐক্যের ফলেই ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে হিন্দুদলের প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। এ অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হলো? এই কালজয়ী পটপরিবর্তনের পশ্চাতে সঙ্ঘের হিন্দু সমাজ নির্মাণের নিরন্তর সুদীর্ঘ প্রয়াসই বিশেষ বিবেচ্য এবং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ২০১৪ সনের ১৬ মে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হবে হিন্দুচেতনার পুনর্জাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ রূপে।

> তাই বিশ্বাস হয়, সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় যিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাঁরই যন্ত্র হয়ে কাজ করছে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এজন্য সঙ্ঘের কাজই ঈশ্বরের কাজ। সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্ম রক্ষার কাজে নিযুক্ত স্বয়ং শ্রীভগবান।

হিন্দুদের দেশজোড়া পুনরুত্থানের পশ্চাদ্পটে সঙ্ঘের অবদান নিয়ে স্বল্পপরিসরে কিঞ্চিৎ আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমেই বোঝা দরকার বিগত সহস্রাধিক বৎসরের পরাধীনতায় এবং স্বাধীনোত্তর খণ্ডিত ভারতে হিন্দুদের বিড়ম্বিত জীবনকথা। ৭১২ খৃস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধুদেশ অধিকারের সময় থেকে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুর্শিদাবাদের পলাশীতে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে জয় পর্যন্ত মুসলমান অপশাসনে এবং ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির (কয়েকটি পকেটে) অপশাসনে ভারত ও হিন্দু সমাজ হয় ক্ষতবিক্ষত। মুসলমান যুগের অসহনীয় বর্বরতার একটি সাধারণ নমুনা হিসেবে সুলতান মামুদের এক মন্ত্রীর পৈশাচিক উল্লাসের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন প্রখ্যাত গবেষক ঐতিহাসিক M.A. Khan (Reference 'Islamic Zihad') "Swords flashed like lighting amid the blackness of clouds and fountains of blood flowed... The friends of Allah defeated their opponents... the Musalmans wreaked their vengeance on the infidel enemics of Allah Killing 15000 of them...making them food for the beasts and birds of prey... Allah also

bestowed upon his friends such an amount of booty as was beyond all calculation including five hunderd thousand slaves, beautiful men and women."

প্রখ্যাত আমেরিকান ঐতিহাসিক Will Durant তাঁর 'The Story of Civilization' বইতে লিখেছেন— "the muslim conquest of India was probably the bloodiest in history." মুসলমান যুগের অমানুষিক অত্যাচারের পর আরম্ভ হলো ইউরোপীয়দের উৎপীড়ন। দুই যুগেই প্রবল লুণ্ঠনে ভারত হয়েছিল সর্বস্বান্ত। এই দুর্দিনে হিন্দুদের সাহায্য করার জন্য শক্তি ছিল মুষ্টিমেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সঙ্ঘের যাত্রা শুরু ১৯২৫ সালে এবং সেই জন্মলগ্ন থেকেই ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য সঙ্ঘের নিরন্তর প্রয়াসের ফলেই হিন্দু জাগরণ হচ্ছে ধীরে ধীরে। এই ২০১৪-র নির্বাচনে হিন্দু ঐক্যের স্বাদ কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। অবশ্যই বিজেপি নেতৃত্বের প্রয়াসও প্রশংসনীয়। তবুও বলতে বাধা নেই সঙ্ঘের মাধ্যমেই হিন্দু সমাজের উপর ঐশী করুণার অবতরণ আমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্ঘের অনবদ্য অবদানের দু' একটি দৃষ্টান্ত এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের প্রয়োগ হলো কলকাতার হিন্দুদের উপর। সরকারি যন্ত্র রইল নীরব। ঘটনার আকস্মিকতায় হিন্দুরা হলো দিশেহারা এবং বিধ্বস্ত, কিন্তু তিনদিন পরে হিন্দুরা ঘুরে দাঁড়াল এবং দস্যুদের পিছু হঠতে বাধ্য করল। ছন্নছাড়া হিন্দুদের কে জোগাল এই দুর্জয় সাহস? কাদের ভরসায় তারা ঐক্যবদ্ধ হলো? উত্তর হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দল। এই সময় ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের অবদানও অসামান্য।

দেশ ভাগের পর অগ্নিগর্ভ পাঞ্জাবে যখন পাকিস্তান থেকে প্রত্যহ ট্রেনে আসছে হাজার হাজার হিন্দুর মৃতদেহ ও রক্তস্নাত ক্ষতবিক্ষত মৃতপ্রায় হিন্দুর দল, তখন এই হতভাগ্যদের দেখাশোনা ও সেবার ভার নিয়েছিল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। তখন দেশে কোনো Emergency Management ব্যবস্থা ছিল না। শুধু পাঞ্জাব নয়, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলে কমবেশি এই দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দুদের ঢল নেমেছিল। তাদের সাহায্য ও সেবা করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল সঙ্ঘের অধিকারী ও স্বয়ংসেবকরা। সহায় সম্বলহীন স্বয়ংসেবকরা এগিয়ে গিয়েছিল কেবল ঐশী করুণার উপর নির্ভর করে। ভারতে সংবিধান গৃহীত হলো ১৯৫০ সালে এবং তার কিছুকাল পরে নিউইয়র্কে খৃস্টান মিশনারিদের এক বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হলো আনন্দোৎসব। কারণ এই যে ভারতীয় সংবিধান সর্ব ধর্মকে সেখানে freely propagate করার সুযোগ দিয়েছে। অতএব মিশনারিরা সদলবলে ভারতে এসে বিনা বাধায় হতভাগ্য ছন্নছাড়া হিন্দুদের খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারবে। বৃটিশ শাসনে আগে থেকেই মিশনারিদের অত্যাচার শুরু হয়েছিল, এখন স্বাধীন ভারতে সেই সুযোগ সুবিধা বহাল থাকল। এটাই তাদের আনন্দের কারণ। ভারতের সেকুলারিস্ট নেতৃত্বের দৌলতে এসব মিশনারিদের মধ্যে কেউ হলেন ভারতরত্ন কেউ বা পদ্মভূষণ। এই সব শঠতা ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে নীরবে কাজ করে চলেছে সঙ্ঘপরিবার। নিপীড়িত হিন্দুদের মধ্যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে অধিকাংশ জায়গায় সঙ্ঘ সাফল্যের সঙ্গে হিন্দুদের মনোবল ফিরিয়ে এনেছে, ধর্মান্তরিত বহু মানুষকে স্বধর্মে পরাবর্তন করিয়েছে বা করছে। তাছাড়া জনজাতিদের মধ্যে একল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান, Seva International-এর মাধ্যমে চিকিৎসা ও বিবিধ সেবা কার্যের দ্বারা সঙ্ঘ মিশনারিদের আক্রমণের মোকাবিলা করছে। এছাড়া সঙ্ঘের বহু প্রকল্প আছে যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় এই প্রতিবেদকের দৃঢ় বিশ্বাস যে যুগপৎ মুসলমান এবং খৃস্টান দুনিয়ার চোখের বালি হচ্ছে হিন্দু ভারত। তাই আমাদের সংবিধান প্রদত্ত সুযোগে এবং তাদের প্রবল অর্থশক্তির প্রয়োগে স্বাধীনোত্তর ভারতে চলছে অবাধ ধর্মান্তরকরণ এবং সন্ত্রাসবাদের বর্বরতা। এই দুর্যোগের মোকাবিলা করতে সেকুলারিস্ট ভারত সরকার অসমর্থ। সেকুলারি বুলির ফুলঝুরিতে এবং দুর্বল নেতৃত্বে ভুগছে সাধারণ মানুষ বিশেষত হিন্দু জনতা। এই দুর্দিনে যে মুষ্টিমেয় দু' একটি সংস্থা হিন্দু জনতার পাশে সারা দেশে দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। এ এক ঐশী প্রেরণা ছাড়া আর কী? ইসলামিস্টদের আক্রমণের কথা বলে শেষ করা যায় না। স্বাধীন ভারতেও মানব সভ্যতার প্রাণপুরুষ হিন্দুদের প্রাণের দেবতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ছিল মুসলমানদের কবলে। এখন অবস্থার পরিবর্তন হলেও মীমাংসা সম্পূর্ণ হয়নি। প্রায় চারশ বছর ধরে হিন্দুরা মন্দির ও রামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। কিন্তু সফল হয়নি। স্বাধীন ভারতও রইল নীরব। ১৯৪৯ সালে সঙ্ঘের একজন প্রচারক ফৈজাবাদের জেলাশাসকের সামনে করজোড়ে আবেদন করলেন। তাঁর প্রার্থনা ও সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রার্থনা— যাতে স্বাধীন ভারতে রামজন্মভূমিতে রামলালার সেবা পূজা আরম্ভ হয়। আবেদন মঞ্জুর হলো গোপনীয়তার শর্তে। তদবধি সেবা পূজা চলছে। কিন্তু মন্দিরের দরজা রইল বন্ধ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আন্দোলনে নামল। ১৯৮৬ সালে স্বয়ংসেবকদের আবেদন ও অনুরোধে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সৌজন্যে ও বিচারকের নির্দেশে এতদিনের বন্ধ দরজা খোলা হলো। পরবর্তীকালে Babri Structure demolition-এ (১৯৯৩-তে) কোনোভাবেই মদত না দেওয়া সত্ত্বেও সরকার আরোপিত দায়ভাগ সঙ্ঘ এড়িয়ে যায়নি। মীমাংসার জন্য আলাপ আলোচনা চলছে ও চলবে। কিন্তু মোদ্দাকথা, রামজন্মভূমিতে আজ যে সেবা পূজা চলছে এবং হিন্দু জনতার দাবির ন্যায্যতা আজ প্রমাণিত হয়েছে তার পেছনে সঙ্ঘের অবদান অসামান্য। এও এক ঐশী ইচ্ছা। এরকম অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী এদেশের মানুষ। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বিরাট হিন্দু সমাজ রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হচ্ছে সঙ্ঘ পরিবার এবং তাঁদের স্বয়ংসেবকদল। ঐশী ইচ্ছাই এই নিরলস কর্মযজ্ঞের উৎসমূল। সঙ্ঘের সুদীর্ঘ সাধনা ও সমাজ সেবার ফলেই সম্ভব হয়েছে কথঞ্চিৎ হিন্দু ঐক্য, যার ফল ১৬ মে, ২০১৪। এ এক নবজাগরণ ও নবযুগের সূচনা। তাই বিশ্বাস হয়, সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় যিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাঁরই যন্ত্র হয়ে কাজ করছে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এজন্য সঙ্ঘের কাজই ঈশ্বরের কাজ। সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্ম রক্ষার কাজে নিযুক্ত স্বয়ং শ্রীভগবান। জয় শ্রীকৃষ্ণ।

(লেখক প্রবাসী বিশিষ্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)

পাপের ঘড়া যখন পরিপূর্ণ এবার কি সুধী সমাজকে রক্ষাকল্পে যুগাবতার আবির্ভূত হয়েছেন ?

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত)

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"।

ভারত তথা বিশ্ব যখন অধর্মে কলুষিত, সৎ নিষ্ঠাবান সাধারণ মানুষ যাঁরা সমাজে বাস করেন অর্থাৎ নাগরিক সমাজ (সিভিল সোসাইটি) যখন ত্রাহি ত্রাহি রব করছেন, সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা যাঁদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, সাধারণ নাগরিক সমাজকে সুশাসন দেওয়ার জন্য যাঁরা নির্বাচিত, রাষ্ট্রের উন্নয়ন এবং সুরক্ষার যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁরা যখন সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হন, ভ্রষ্টাচার যখন দেশ এবং দেশবাসীকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করেছে, তখনই কেউ না কেউ এই ভারতে ন্যায় ও নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে আসেন।

বিগত অর্ধ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিদেশি শত্রু রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার উপর বারংবার আঘাত হানছে। সর্বত্র রাষ্ট্রভাগ, রাজ্যভাগ, সমাজকে বিভাজন করার দাবি। এ যেন সেই রামায়ণ, মহাভারতের যুগ। একদিকে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, অন্যদিকে সীতার অপহরণ।

যে রাষ্ট্রে নারী দেবীরূপে আরাধ্য হন, সেখানে প্রতি মিনিটে বোধহয় ১৩ জন অবলা নারী ধর্ষিতা হয়ে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেককেই হত্যা করে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। মহিলারা পথেঘাটে এমনকী নিজেদের গৃহকোণেও আর সুরক্ষিতা নন। বিদ্যালয়ে গিয়েও শিশু কন্যাও মানুষের লালসার শিকার হয়ে চলেছে। নাগরিক সমাজ মোমবাতির নীরব মিছিল করতে পারে, ধিক্কার জানাতে পারে কিন্তু প্রশাসন নখদন্তহীন অকর্মণ্য অসার।

সরকারি সচিবালয়ে, বিভিন্ন অফিসে যারা কর্মচারী দ্বারপাল, দপ্তরি, পিওন থেকে চেয়ারে বসা কেরানিকুল, বিভিন্ন স্তরে তাদের উপরে বসা আধিকারিকগণ, প্রশাসনের সর্বোচ্চ শিখরে বসে থাকা আধিকারিকদের প্রায় আশি থেকে নব্বই শতাংশ সরকারি কর্মচারী ভ্রষ্টাচারী। বিশেষ করে যে সব বিভাগ নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনের বিষয়ে সরকারি মান্যতা অথবা সিলমোহর দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন তাঁদের ভ্রষ্টাচারের এবং অন্যায় দাবির যেন কোনো সীমা পরিসীমা নাই। যিনি রেলের টিকিট বিক্রয়ের দায়িত্বে, যিনি চলমান ট্রেনের যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করার দায়িত্বে, যিনি যাত্রীদের বসা অথবা শোয়ার আসন দেওয়ার অধিকারী উৎকোচ হাতে আসামাত্র সব সমস্যার সমাধান করে দেন। যাঁর নীতিগত ভাবে সেই সুবিধা পাওয়ার কথা উৎকোচ ছাড়া তাঁদের কথা শোনার আগ্রহ কারও নেই।

বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বড় বড় মালিকরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে যে কোনো বরাত পেয়ে যেতে পারেন। কেউ আরও হাজার হাজার কোটি টাকার পশুখাদ্য কেনার অজুহাতে অর্থ আত্মসাত করে ধরা পড়ার পর আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েও ছাড়া পেয়ে যান। তিনি আবার নতুন উদ্যমে দেশ সেবার ব্রতে অর্থাৎ নির্বাচন যুদ্ধে সসৈনিক, সপারিষদ নেমে পড়েন।

এমনকী যে বিচার বিভাগের উপর এই ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের আপামর নাগরিক সমাজের অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই বিচারালয়ের গরিমা কিছু অর্থের বিনিময়ে ধূলিলুণ্ঠিত করতে দ্বিধা করেননি। বিচারালয়ের পেশকার থেকে, মামলার নথিপত্র সুরক্ষিত রাখার আধিকারিক সকলেই এই রোগে পীড়িত।

আইনের চক্ষে সকলেই সমান। কিন্তু গ্রামের সাধারণ কৃষক এফিডেভিট করে উকিলবাবুর প্রাপ্য যুগিয়ে আইনের দরজায় দাঁড়াবার আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী নন, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি দিয়ে নামীদামি উকিলবাবুর মাধ্যমে আইনের বুলি আউড়িয়ে বড় বড় দোষীও বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। তাহলে আইনের চক্ষে সকলেই সমান এই মিথ্যাটা সংবিধান থেকে মুছে ফেললেই বোধহয় ন্যায় করা হয়। কৃষকদের কথা চলে এল। এদের জন্য দেশসেবক সরকারি নেতৃত্বের অশ্রুজল বাঁধ মানে না। কিন্তু এই তথাকথিত কৃষক সমাজও বর্তমানে কম ওয়াকিবহাল নন। কীভাবে অপরের জমির ফসল চুরি করতে হয়, সামরিকবাহিনীর ও অন্য অনুপস্থিত জমি মালিকের জমি ভাগচাষি হিসাবে নাম সরকারি খাতায় তুলতে হয় এবং সেই বিভাগীয় কর্মচারীদের কাকে কীভাবে কত উৎকোচ দিতে হবে সেই সব তথ্য তাদের নখদর্পণে।

যদিও ক্ষেত চাষ করা, বীজ বপন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কোনোই ব্যুৎপত্তি নেই, সারাজীবন কোনো কলকারখানায় কাজ করে আজ তারা ভাগচাষি হিসাবে মান্যতা পেয়েছে। অনেক চাষিই আজ জমির দালালিতে হাত পাকিয়েছে।

যারা ফুটপাথ, রাস্তা অধিকার করে বাজার বসিয়েছে, অথবা বিভিন্ন বাজারে পণ্য ব্যবসায়ী, তাদের ওজনের দাঁড়িপাল্লা অথবা বাটখারার ৮০ শতাংশেই কারচুপি করা! নাগরিক সমাজের ক্রেতারা বাজারে গিয়ে

সেই ভ্রষ্টাচারের শিকার। এক শ্রেণীর আড়তদার, যারা পণ্য মজুত করে হিমঘরে ধরে রেখে কৃত্রিম পণ্যসঙ্কট সৃষ্টি করে, হাজার হাজার কোটি টাকার মুনাফা লোটে তাদের প্রতিরোধ করার কি কেউ আছেন? যদিও বা থাকেন কড়কড়ে নোটের জুতো পেটায় তাঁরা অবশ হয়ে যান।

কিন্তু অন্তত কুড়ি শতাংশ সৎ কর্মচারী, ব্যবসায়ী তো রয়েছেন তাঁরা কেন সোচ্চার নন? যে কোনো দপ্তরে অথবা কর্মক্ষেত্রে, আয়কর বিভাগ অথবা পণ্যকর বিভাগ, পৌরসভা অথবা পঞ্চায়েতেই হোক তাঁদের একমাত্র পথ। 'খারাপ অথবা অন্যায় কথা শুনিনি, খারাপ কথা বলব না, খারাপ কথা অথবা কাজ দেখব না'— মহাত্মা গান্ধীর এই প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করা। অন্যথায় দুর্গম স্থানে স্থানান্তরণ থেকে মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

হে পাঠক, এর পরও কি আপনার মনে হবে, 'পরিত্রাণায় সাধূনাং' অর্থাৎ সুধী সমাজের পরিত্রাণের জন্য কোনো ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাবের সময় এখনও আসেনি?

এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, দেশসেবা করার জন্য, দেশের জন্য এবং দেশবাসীর জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দু এবং প্রাণ দেওয়ার জন্য সামরিকবাহিনী তথা পদাতিক বাহিনীতে যোগদান করা উচিত। অন্যথায় দেশসেবা করার সুযোগ নেই। দেশসেবার নামে যাঁরা নির্বাচনের পথ নিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের সেবা করার জন্যই সমর্পিত প্রাণ।

তাঁকে বলেছিলাম, দেশ সেবার জন্য সামরিক পোশাক পরিধানের কোনোই প্রয়োজন নেই। আপনি করণিক হোন, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি অথবা ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষক, অধ্যাপক, স্কুল মাস্টার যেই হোন, নিজের কাজটা সৎভাবে নিঃস্বার্থ ভাবে, সমস্ত চেতনা নিয়ে করবেন। যদি মনে করেন আপনার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উপযুক্ত সেবা আপনি দিয়েছেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেশসেবা আর কিছুই হতে পারে না। যদি প্রতিটি ভারতবাসী তাঁদের নিজের নিজের কাছে সেই মত্ততা, শ্রদ্ধা এবং নাগরিক সমাজের কল্যাণের চিন্তা মাথায় রেখে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন ভারতবর্ষ আপন গরিমায় বিশ্বে সেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি নিশ্চয়ই অধিকার করবে। কিন্তু দেশ থেকে এই হিংসা, তঞ্চকতা, সমাজ থেকে নারী নিপীড়নের ঘটনা, সর্বস্তরে ভ্রষ্টাচার নিবারণ করার দায়িত্ব সরকারের।

ভারতবর্ষ যখনই এমন সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে বহু বহুবার ধরে, কোনো না কোনো যুগপুরুষ আবির্ভূত হয়ে দেশ ও সমাজকে কলুষমুক্ত করেছেন। কাজটুকু শেষ করে তাঁরা প্রস্থানও করেছেন অতি সত্বর। পাপের ঘড়া এখন পরিপূর্ণ। চতুর্দিকে হানাহানি, হত্যা, লোভ ও লালসায় সাধারণ শান্তিপ্রিয়, সৎ নাগরিক সমাজ ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছেন।

ভারত তথা বিশ্ববাসী প্রতীক্ষায় রয়েছেন, কোথায় সেই পরিত্রাতা জন্মগ্রহণ করে মানব সমাজকে পরিত্রাণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন! আকাশের নক্ষত্রকুল কি সেই স্থানের দিকে জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানীদের দিক নির্দেশ করছে? ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

নেত্রদান মহাদান

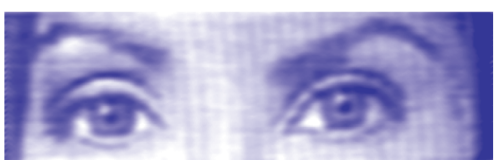

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

গীতাবর্ণিত অন্যায়বিনাশ : আজকের প্রেক্ষিতে

অম্লানকুসুম ঘোষ

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতভূমিতে রচিত মহাগ্রন্থের এই মহাবাণী সেদিনকার মতো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। মানবসমাজকে তা আজও করে অনুরণিত। তবে কালপয়োধির অগণিত ঊর্মির উত্থান-পতনের অবসানে বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বাণীর অর্থকে বিচার করতে হবে বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে। যখন শত শত মহামানবের লীলাক্ষেত্র এই ভারতভূমিতে অন্যায়ের দাপটে সত্য ও ন্যায়ের পূজারিরা হয়ে পড়েন বিপর্যস্ত, তখনই তাঁদের রক্ষাকল্পে আবির্ভূত হবেন ভগবান। বাণীর আক্ষরিক অর্থ তাই। রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থের বিশ্লেষণ আসা যাক। স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্য সমস্ত মহামানব যাঁরা নররূপী নারায়ণের পূজারি ছিলেন, তাঁরা বলেছেন আত্মবিকাশের মাধ্যমে আত্মশক্তির মধ্যেই ঐশ্বরিক শক্তির উন্মেষ ঘটানোর কথা। চেতনার বিকাশের মাধ্যমে নিজমধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি করে, জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনুভব করে প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিমানুষকেই তাই দাঁড়াতে হতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এই সংগ্রামে।

চিরকালই আলোর পাশাপাশি অন্ধকারের মতো, রোদের পাশাপাশি ছায়ার মতো, ন্যায়ের পাশেই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবস্থান করেছে অন্যায়। সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরন্তন সংগ্রামের মাধ্যমেই সমাজের ন্যায়পরায়ণ সত্তা নিজেকে রক্ষা করেছে। বর্তমান সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাজের সর্বস্তরে কর্কট রোগের জীবাণুর ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে অন্যায় ও দুর্নীতি। এই অন্যায়ের বহু পর্যায় ও প্রকাশ রয়েছে। কোথাও বলবানের পেশীশক্তি, কোথাও ধনবানের অর্থশক্তি, কোথাও ক্ষমতাবানের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে। জীবনচক্রের ন্যায়ালয়ে তারা বঞ্চিত হয় ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে। এই বহুমুখী অন্যায়ের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে সমাজের জাগ্রত শুভশক্তিকে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য স্মর্তব্য। 'সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে'— বর্তমানে কলিযুগে সঙ্ঘশক্তি অর্থাৎ সংগঠিত মানবশক্তি অসাধ্য সাধন করতে পারে। তাই জাগ্রত সচেতন ব্যক্তিমানুষদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই রুখে দাঁড়াতে হবে। যে কোনো সংগ্রাম, তা যত মহৎ লক্ষ্যেই শুরু হোক না কেন তাতে যদি ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ-চিন্তার মলিনতা থেকে যায় তাহলে সেই সংগ্রাম কালখণ্ডের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমগ্র দেশের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে একমাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'একের অনলে বহুরে আহুতি' দিয়ে সচেতন নাগরিক সমাজকে এই মহাসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে অরাজনৈতিকভাবে। কারণ রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতার নির্ণায়ক, আর এই রাষ্ট্রক্ষমতা বা তার স্নেহচ্ছায়াশ্রিত ব্যক্তিবর্গের অন্যায়ের বিচার বা তার প্রতিবাদ করাই নাগরিক সমাজের কর্তব্য। তাই এই প্রতিবাদকারীরা নিজেরা রাজনীতির পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় অরাজনৈতিক, স্বার্থশূন্য, ঐক্যবদ্ধ ও আত্মবিকশিত নাগরিক সমাজকেই বর্তমানে আবির্ভূত হতে হবে 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্'।

সাম্প্রতিক অতীতের দিকে যদি চোখ ফেরাই তাহলে সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে যে ভারতীয় সমাজে এইরকম নাগরিক জাগরণের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে একথাও সর্বজনদৃষ্ট হয় যে সেই জাগ্রত আন্দোলনসমূহ বেশিদিন আপন লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারেনি, কক্ষচ্যুত হয়েছে অকালেই। কারণ নানাবিধ। প্রথমত, এই আন্দোলনসমূহ অরাজনৈতিকভাবে শুরু হলেও সময়ের ব্যবধানে পরোক্ষভাবে কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে তারা চালিত রাজনৈতিক পালাবদলের অনুঘটক হিসেবে কাজ করলেও রাজনৈতিক শক্তির নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে কাজ করতে পারেনি চিরন্তনভাবে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় রাজনীতির প্রভাব না থাকলেও নাগরিকসমাজ নিজেরাই বিপথগামী হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভ্রান্তিতে। তৃতীয়ত, রাজনীতিমুক্ত ও স্থির লক্ষ্য নাগরিকসমাজও অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট সাফল্য লাভ করার পর অথবা নির্দিষ্ট কালখণ্ডের অবসানের পর উৎসাহহীন ও শিথিল হয়ে পড়ে। তাই অতীতকে শিক্ষকের ভূমিকায় রেখে বর্তমান নাগরিক সমাজকে এই ত্রিবিধ ত্রুটি থেকে দূরে থেকে আপন লক্ষ্যে থাকতে হবে অবিচল।

দেশের যা কিছু অগ্রগতি সবই হয় শান্তিপ্রিয় নাগরিক সমাজের দ্বারা। দেশের সমস্ত উৎপাদন, সমস্ত পরিষেবা, সমস্ত উদ্ভাবন, সমস্ত নতুন সৃষ্টিই সাধারণ নাগরিকের হাত ধরে হয়। সেখানে শক্তিমদমত্ত অন্যায়কারীরা শুধুই পরগাছার ভূমিকায়। কাজেই একথা অনস্বীকার্য যে সমাজের ধারকশক্তি স্বরূপ নাগরিকসমাজ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে অন্যায়কারীরা পরাস্ত হবেই। নতুন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবেই রাষ্ট্র ও সমাজের ভাগ্যাকাশ।

আমাদের দেশের রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও কিয়দংশ আত্তীকরণের দ্বারা গঠিত। পরোক্ষ গণতান্ত্রিক এই শাসনকাঠামোর অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও মোটের ওপর মহাকালের বিচারে পরীক্ষিত ও সমম্মানে উত্তীর্ণ। সংশোধনের অবকাশ থাকলেও এই কাঠামোকে বর্জনের কোনো প্রয়োজন কেউই অনুভব করে না। কিন্তু দেশের, জাতির বিকাশে রাষ্ট্রব্যবস্থাই একক ভাবে

স্বয়ংসম্পূর্ণ (Mutually exhaustive) নয়। সমাজব্যবস্থা, বিশেষত সদাজাগ্রত সমাজব্যবস্থা জাতির বিকাশে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বিশেষত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। বোধগম্যতার সরলীকরণের উদ্দেশ্যে উপমার সাহায্য নেওয়া যাক। 'কালের রথযাত্রা'য় অগ্রসরেচ্ছু ভারতবর্ষকে যদি রথের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে রথাকর্ষণকারী অশ্বের ভূমিকায় থাকছে রাষ্ট্রশক্তি। সেই অশ্বরূপী রাষ্ট্রশক্তি যতই সক্রিয় ও সক্ষম হোক না কেন রথরজ্জুর নিখুঁত নিয়ন্ত্রণে যদি তার গতিকে নিয়ন্ত্রিত না করা যায় তবে তার বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে রথরজ্জুর ভূমিকায় বিচারবুদ্ধি ও রথরজ্জুধারী সারথির ভূমিকায় থাকছে জাগ্রত ও সচেতন নাগরিকসমাজ। আর রথারোহীর স্থানে থাকছে আপামর দেশবাসী।

একথা সত্য যে রাষ্ট্রভাগ্যচক্রের অনন্ত ঘূর্ণনের এক বিশেষ পর্যায়ে আজ রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, গণতান্ত্রিক পুনঃপরীক্ষার কষ্টিপাথরে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন সসম্মানে। তবে সারথি রূপী নাগরিক সমাজের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এই সত্যপথাবলম্বী রাষ্ট্রনায়কেরাও হতে পারেন কক্ষচ্যুত। কারণ 'Power correpts and absolute power absolute corrupts'। আর মূল্যায়ন ভীতিহীন শক্তি দ্রুতপদক্ষেপে পতনাভিমুখী হয়। তাই নিয়ন্ত্রকের ও বিচারকের ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাগরিক সমাজকে নিরন্তর অধ্যবসায় চালিয়ে যেতেই হবে।

কুরুক্ষেত্রে রথারূঢ় যোদ্ধাদের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের সংগ্রামের পূর্বমুহূর্তে উচ্চারিত হয়েছিল মহাগ্রন্থ গীতা ও তার মধ্যস্থিত ওই উপরিউক্ত মহামন্ত্র। সু ও কু-এর চিরন্তন দ্বন্দ্বে মানবমনই চিরকালীন কুরুক্ষেত্র। অন্তর্জগৎ থেকে বহির্জগতে এলে সেই কুরুক্ষেত্রই খুঁজে নিতে হয় পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। অস্ত্র হিসেবে থাকে কলম, এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়াও একটি বড় অস্ত্র বর্তমান নাগরিক সমাজের কাছে। আপন আপন পেশাগত ক্ষেত্রের সাফল্য ও সততা দিয়েও এঁরা অনেক সময়ই প্রকাশ করেন নিজের শক্তিকে।

শক্তির উৎস ভারসাম্য বা সমন্বয় যাই হোক শেষ অবধি কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে জয়ী হয়েছিল ন্যায়পক্ষ। বর্তমানের সর্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রেও জয়ী হবে ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনকারীরাই। নবপ্রভাতের সূচনা হবে। ভারতীয় রাষ্ট্রসমাজ-ব্যবস্থায় চিরকাল-ই রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাষ্ট্রশাসক সমাজের নিয়ন্ত্রণে। প্রাচীনকালে রাজ্যাভিষেকের সময় অভিষেকরত রাজা বলতেন 'ন দণ্ডস্যৌ', অভিষেককারী পুরোহিত শমীবৃক্ষের ডাল মস্তকে স্পর্শ করে বলতেন 'ধর্মদণ্ডস্যৌ'। অর্থাৎ রাজার বক্তব্য তাকে কেউ দণ্ড দিতে বা শাস্তি দিতে পারবে না, অভিষেককারী পুরোহিত সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে স্মরণ করাতেন ধর্ম অর্থাৎ ন্যায় তাঁকে শাস্তি দেবার অধিকারী। সেই শাস্তিপ্রদানের অধিকার স্বীকার করে তবে সিংহাসনারূঢ় হতেন নতুন রাজা। আজকের নবপ্রভাতে এইরূপ ভাবেই যদি সমাজের শাস্তি-বিচার-পর্যবেক্ষণ-এর অধীনে থাকে রাষ্ট্রশক্তি তবেই গীতার সেই মহাবাণী সফল হবে। ■

পাঠ্য পুস্তক প্রসঙ্গ

সাজেশন — নবম-দ্বাদশ

সুপার নোটস্ বেস্ট সাজেশন, S. Roy সম্পাদিত UTTARAN PROKASHANI প্রকাশিত লেটার মার্ক A^+ বই।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রকাশিত বহু শিক্ষক/ শিক্ষিকার প্রশংসাপ্রাপ্ত ৮০% থেকে ১০০% কমন দিতে সিদ্ধস্থ একমাত্র সাজেশন্ বই লেটারমার্ক A^+ পড়ুন ও নিশ্চিন্তে পাশ করুন। প্রতি বই-এর মূল্য ৫০ টাকা।

গণিত

লোয়ার শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ঋক প্রকাশনীর সোনালী গণিত সম্পূর্ণ কালার অত্যাধুনিক গণিত বই। মূল্য ৬০ টাকা।

শিশু রচনা

রচনা বই :- দ্বিতীয় শ্রেণী হতে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য। এই শ্রেণীর শিশুদের সমস্ত প্রকার পরীক্ষার জন্য শুধু একটি রচনা বই নয়, রচনার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ আমাদের লক্ষ্য। আমরাই প্রথম জন্মজাত দেশভক্ত ডাক্তারজীকে শিশু রচনা বই-এ অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রাপ্তিস্থান

এজেন্সীর জন্য বা ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন ঃ চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, ৮/সি, ট্যামার লেন কলকাতা-৯। মোঃ- 9832043515 / 9635754004

সবার প্রিয়

বিল্লদা

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

সজ্জন হিসেবে পরিচিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা কাদের জন্য প্রাণপাত করছেন ?

সুহাস বসু

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা, সব সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলের নেতারা এদেশের মুসলমানদের ওয়েল— বিইং, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়ই চিন্তিত। প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো সংবাদপত্রে এবিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশিত হচ্ছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এঁরা কিন্তু প্রায় সবাই হিন্দু, যাঁদের জন্ম হয় ১৯৪৭-এর পরে, নয়ত সে সময় তাঁরা হাঁটি হাঁটি পা পা করতেন। এঁরা কেউ মুসলমানদের ভয়াবহ নৃশংস ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক মূর্তি দেখেননি। না দেখলেও শোনেননি কি? শুনেও কি না শোনার ভান করছেন? তবে একটি বিষয়ে এরা একমত। এঁদের মতে হিন্দুমাত্র-ই সাম্প্রদায়িক আর মুসলমান মাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। আর বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল, তারা সব সময় মুসলমান বিরোধী বিভেদের রাজনীতি করে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের দেশের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের সব বিক্রম হিন্দু মেজরিটি এলাকায়। গত তিরিশ ও চল্লিশের দশকে যখন মুসলমানরা সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতি তত্ত্বের দাবি তুলে সারাদেশে ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছিল তখন এই তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে যখন মুসলমানরা হিন্দু পণ্ডিতদের উৎখাত করে তখনও এদের কারও পাত্তা পাওয়া যায়নি।

গত লোকসভা ভোটের আগে যখন বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে দলের প্রধান প্রচার মুখ করে তখন থেকে এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা একটা গেল গেল রব তুলতে থাকেন। তারপর দল যখন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মনোনীত করে তখন যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিরামহীন গোলাগুলি বর্ষণ করা চলতে থাকে। অতএব এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা মোদীকে ঠেকানোর জন্য জান-মান কবুল করে চেষ্টা করতে থাকেন, যাঁদের কোনোদিন ভগবানের নাম করতে শোনা যায়নি হঠাৎ তাঁদের ভগবানে ভক্ত হতে দেখা গেল। তাঁরা মোদী তথা বিজেপিকে ঠেকানোর জন্য কোনো দোয়া প্রার্থনা করতেও পিছপা হননি। কিন্তু হায় একি হলো? এত করেও মোদী বা বিজেপি-কে ঠেকানো গেল না। এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা তখন ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে ভোল পাল্টে নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নানা গুণ দেখতে পাচ্ছেন। তবে স্বভাব যাবে কোথায়, তাঁরা এখন মোদীর হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে তাঁকে নানা উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁকে সতর্ক করে চলেছেন তিনি যেন সব ধর্মকে সমান চোখে দেখেন। কিছুতেই যেন ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থাৎ মুসলমান তোষণ নীতি থেকে সরে না আসেন। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মোদীকে গুজরাট দাঙ্গায় জড়িত হওয়ার অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেও তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষতা মানতেই হবে। তাদের আরও হুঁশিয়ারি সারা পৃথিবীর লোক মোদীর কার্যকলাপের উপর নজর রাখবে ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক কারা এই মুসলমান যাদের জন্য এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের রাতের ঘুম নেই। কারা এই মুসলমান যাদের ভালোর জন্য এদের মধ্যে 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান তার লাগি কাড়াকাড়ি' করার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। আলকায়দা, আই এস আই, মুসলিম ব্রাদারহুড, তালিবান, বেকো হারাম ইত্যাদি ইসলামী উগ্রপন্থীরা যারা সারা পৃথিবীতে ব্যাপক হত্যালীলা চালাচ্ছে তাদের কথা ছেড়েই দিলাম। আমি শুধু ভারতের মুসলমানদের কথা বলছি।

(১) ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ সাল, কলকাতায় সুরাবর্দীর নেতৃত্বে মুসলমানরা শহরের বুকে হাজার হাজার নিরীহ হিন্দুর রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। (২) সেই বছরেই অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে শত শত হিন্দুকে হত্যা করে।। তাদের বাড়ির মেয়েদের গণধর্ষণ করে হারেমে পুরে দেয়। হাজার হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক তারা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে। (৩) ২০০২ সালে গোধরার ৬৭ জন নিরীহ হিন্দু তীর্থযাত্রীকে ট্রেনের কামরায় আগুন দিয়ে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারে। (৪) এই মুসলমানরা ১৯৫০ সালে বরিশালে এবং ১৯৬৪ সালে ঢাকায় হাজার হাজার হিন্দুকে কচুকাটা করে। (৫) পৃথক জাতির তত্ত্বে অনড় থেকে ভারতমাতাকে তিন টুকরো করে তার দুদিকে দুটি ইসলাম রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। (৬) এরা পাকিস্তান অর্জন করেও ক্ষান্ত হয়নি। লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে তাদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে, ফলে আজ পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দু শূন্য। বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য করার পথে। সেখানে তাঁদের সংখ্যা ২২ শতাংশ কমে ৯ এ এসে দাঁড়িয়েছে। (৭) এরা অবিভক্ত বাংলায় ৭০ শতাংশ ভূমি দখল করে এখন বাকি ৩০ শতাংশ, যা এখন পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত— গ্রাস করতে চাইছে। (৮) এরা ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম গাওয়া তো দূরের কথা— যেখানে তা গাওয়া হয় সেখান থেকে তারা উঠে চলে যায়। (৯) এরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কেটে টুকরো টুকরো করার হুমকি দেয়— সুযোগ পেলে তা করবেও। (১০) সাত শত বছর ধরে ভারতের হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। বলপূর্বক ধর্মান্তর, নারী হরণ ও মন্দির ধ্বংস ছিল তাদের নিত্য কর্ম। (সূত্র : ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ)।

এদের জন্যই দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের চিন্তা ও উদ্বেগের শেষ নেই। হিন্দুকুলে জন্মেও এঁরা কি করে এত হিন্দু বিরোধী ও মুসলমান প্রেমী হলেন বুদ্ধিতে তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত আই আর এস)

চিঠিপত্র

কৌলাচার

তন্ত্র নিয়ে পড়াশুনো করছি। কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, শঙ্করাচার্যের 'আনন্দলহরী' আর বাংলার বিভিন্ন রচনা-র আগে পড়েছি 'কঙ্কাল মালিনীতন্ত্র', 'শ্যামাসপর্যাবিধি' ইত্যাদি। এর মধ্যে হঠাৎ পেলাম নবকুমার ভট্টাচার্যের চমৎকার নিবন্ধ 'কৌলাচার'। এমন একটি লেখা 'স্বস্তিকা'র মান বাড়িয়েছে। সব মত ও পথের প্রতি উদার সমদৃষ্টি লেখকের— একে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। অভিনন্দন।

পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এই রকম রচনা আরও বেশি করে মুদ্রিত হোক। আপনি 'মহাচীনাচার' সম্পর্কে 'রুদ্রযামল' থেকে যে কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন তার নির্যাস আপনার লেখাতে আছে। বেদ আচারকে অস্বীকার, পঞ্চতত্ত্ব (যার এক অর্থ পঞ্চ ম-কার) সাধন, অথর্ববেদোক্ত 'মহাচীনাচার', মহাদেব যেখানে বুদ্ধরূপে বিদ্যমান— ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেব যে বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার করছেন তার অর্থ ও তাৎপর্য গভীর। এই কৌলাচার ভারতীয় বেদ বাহ্য বলে মনে হলেও তা অথর্ব বেদোক্ত। সুতরাং ভারতীয় নয় এমন কথা নিতান্তই ভুল। ঐতিহাসিক হীরানন্দ শাস্ত্রী 'The Origin and Cult of Tara' গ্রন্থে লিখেছেন, তারা দেবীর উদ্ভব ঘটেছে ভারত-তিব্বতের মধ্যবর্তী, সীমানার কোনো স্থানে। ('Regarding the place of Origin of Tara or Tara-Worship, I am of opinion that we should rather look towards the Indo-Tibetan borderland.')। খুব সম্ভব লাদাখ অঞ্চলে তারা-উপাসনা সূচিত হয়। ('Tara worship originated some where towards Ladakh')। (ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ, ১৯২৫; ১৩ পৃ.)।

হীরানন্দ শাস্ত্রীর মতটি প্রণিধানযোগ্য। কাশ্মীরের শৈবসিদ্ধান্ত তথা প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের বিকাশ আচার্য অভিনব গুপ্তের 'তন্ত্রালোক', উৎপলদেবের 'ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা কারিকা', কিংবা বিভিন্ন তাত্ত্বিকের লেখা 'মালিনী বিজয়', 'শৈবসূত্র', 'রুদ্রযামল', 'শিবদৃষ্টি', 'প্রত্যভিজ্ঞ বিমর্শিনী', 'প্রত্যভিজ্ঞ হৃদয়' প্রভৃতি উচ্চদার্শনিক রচনার কথা মনে রাখলে হীরালাল শাস্ত্রীর অভিমত স্বীকার্য।

ভারতে তন্ত্রের তিনটি প্রস্থান— দক্ষিণ ভারতের কেরলাচার নামে কথিত শ্রীবিদ্যা (বা ললিতা, ষোড়শী, কামেশ্বরী, ত্রিপুরা-সুন্দরী)- কেন্দ্রিক; যার তাত্ত্বিক উৎসে আছেন শঙ্করাচার্য; তাঁর 'আনন্দলহরী' বা 'সৌন্দর্যলহরী', ভাস্কর রায়-এর 'সৌভাগ্য ভাস্কর' প্রভৃতি সাধক ও তাঁদের তত্ত্ব কথা। দ্বিতীয় কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞ দর্শন। তৃতীয় গৌড়-কামরূপ-উৎকল-বিহারে প্রচলিত ক্রমাচার বা ক্রিয়াকেন্দ্রিক তান্ত্রিক আচার। এই তিনটি প্রস্থানের মধ্যে গভীর ও সূক্ষ্ম মিল বিদ্যমান। তারা-কেন্দ্রিক 'চীনাচার'-ও ভারত থেকেই আক্ষিপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। নীল সরস্বতী, একজটা, পর্ণশবরীর অজস্র মূর্তি পূর্ব ভারতে ছড়ানো আছে। তারার কত যে রূপ বাংলা ও বাংলার বাইরে প্রচলিত তার ইয়ত্তা নেই।

বরোদা প্রদর্শশালায় রক্ষিত 'মঞ্জুশ্রী', 'চুলা', 'খদিরবর্ণী তারা', কলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত 'শৈরাত্মা', 'মারীচী'-সহ কত যে মূর্তি পাওয়া গেছে! কাছাকাছি সময়ে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহে রক্ষিত অজস্র বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী মূর্তির বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। বৌদ্ধ সংস্কৃতি ভারতেরই--- তার প্রস্থান চীন-জাপান-কোরিয়া-শ্যাম- দেশে ছড়িয়ে পড়া ভারত থেকেই। তিব্বত-ব্রহ্মদেশ-গান্ধারকে পৃথকভাবে লিখলাম না— এসব অঞ্চল মহাভারতের বাইরের নয়।

নবকুমারবাবুর রচনার এ হলো বাইরের দিক। ভিতরের দিক--- মন্ত্র, দীক্ষা, অভিষেক। তারও ইঙ্গিত রয়েছে ছোট্ট রচনাটিতে। সংস্কৃত-পাণ্ডিত্যের এই এক স্বভাব— সূত্রাকারে গভীর ব্যঞ্জনা রেখে চলেন তাঁরা। একে অভিনন্দন জানানো কর্তব্য।

তন্ত্র-দর্শনের অন্য কতকগুলি আশ্চর্য বিস্তার-সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছি। যেমন—

১. বর্ণতত্ত্ব : মাতৃকা বর্ণের সঙ্গে নৃ-মুণ্ড প্রতীক যুক্ত করে, দেবী কালিকাকে মুণ্ডমালিনী বলে দেখানো; বিদ্যুজ্জিহ্ব মহামায়া 'বিদ্যা' স্বরূপিণী— মহাবিদ্যার উদ্গাত্রী— বাক্— পরমশিবের উন্মুখী উন্মেষী শক্তি। এখানে ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) আর মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycholinguistics) প্রভৃতি বিদ্যায়তনের সম্ভাবনা খেয়াল করে বিস্ময় জাগে।

২. নাড়ীতত্ত্ব : শরীরের অজস্র নাড়ী— তার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ; সুষুম্নান্তর্গত বজ্র ও শঙ্খিনী নাড়ীর সবিস্তার তত্ত্ব। এখানে আধুনিক শারীরবিদ্যা (Physiology)-র সম্ভাবনা লক্ষ্য করি।

৩. নাদ বিন্দু তত্ত্ব : নাদ কেমন করে বৈখরী-পরা-মধ্যমা-পশ্যন্তী হয়ে ওঠে, বিন্দু হয় বিসর্গ— দ্বিবিন্দু কেমন করে জগৎ ব্যাপারে ছড়িয়ে পড়ে--- তার মধ্যে বিশ্বরহস্য আর জগৎ রহস্য ধরতে পারি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ভারততত্ত্ব বিদ্যার একটি ভাব ছিল অহঙ্কারী। সেখানে বিশ্ব বিজ্ঞানের ধাত্রী ভারত এই দাবি বেদ-বেদাঙ্গ- বেদান্ত ভাষ্য থেকে প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। যোগ ও তন্ত্রের সঙ্গে উত্তরোত্তর পরিচয় ঘটেছে আমাদের। বোঝা গেছে পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এখানেও। এসব কথা ব্যাখ্যার বহু অবকাশ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভ্রান্ত মার্কসীয় কার্যকলাপ আমাদের তত্ত্ববিদ্যাকে জড়ীভূত পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক করেছে। এর সূচনা কবে থেকে? সম্ভবত দেশে সাম্যবাদীদের সূচনাকাণ্ড থেকেই। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান ধর্মকেন্দ্রিক উত্তেজনা--- খিলাফত আন্দোলনে যার সূচনা। তাসখন্দে তুরস্ক থেকে ব্যর্থ ভারতীয় ধর্মধ্বজীদের মাধ্যমে যে দলের সূচনা। ওরা ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার

প্রচারক— প্রথম থেকেই ইসলাম ধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়াকেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে মনে করেন। কংগ্রেস-উপকংগ্রেস দলগুলিও এই বিকৃতি থেকে মুক্ত নয়। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের চমৎকার গবেষণা 'Communism and Slavery in Ancient India' পড়লে বোঝা যায় ভারতকে তাঁরা চিনতেন কিন্তু তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে সামনে আনেননি। বেশ কিছু মার্কসপন্থী পণ্ডিত (একমাত্র ব্যতিক্রম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত) পশ্চিমের চোখে ভারতদর্শন করে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ভ্রান্ত উত্তেজনা— আর্য ভাষা গোষ্ঠীর বিপক্ষতা প্রভৃতি দেশবিরোধী মতপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু এভাবে দু'তিনটি প্রজন্মের বাঙালি ও উপকূলভাগের ভারতবর্ষ (অন্ধ্র-তামিলনাড়ু-কেরল ও মহারাষ্ট্র)-কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা সফল হলেও সর্বত্র ওই ভ্রান্ত ভাবাদর্শ ক্ষীয়মান। শুধু ভারতে নয়, সর্বত্র। রুশ-চীন- পূর্ব ইউরোপ সর্বত্র সাম্যবাদের ভস্মাধার থেকে জাগছে জাতীয়তাবাদ। এ হলো ইতিহাসের নির্দেশ।

নবকুমারবাবুর 'কৌলাচার' পড়ে এত কথা মনে এল। এরকম আরও লিখুন। বাঙালির চোখের সামনে থেকে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার রঙিন চশমাটি সরিয়ে দিন। গর্দভ প্রতিপালিত সিংহশিশু নিজেকে চিনতে পারলে আর তাকে আটকাতে পারে এমন ভুয়ো আদর্শ নেই।

—অচিন্ত্য বিশ্বাস,
অধ্যাপক : বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলকাতা-৩২।

ভাষা-জননী সংস্কৃত বাংলায় হোক স্বাগত

বহু ভারতীয় ভাষার জননী হলো সংস্কৃত ভাষা। লালনে পালনে যে জননী আমাদের আলো দেখান, যাঁর হাত ধরে আমরা জ্ঞানের প্রসারতা লাভ করি তাকে ত্যাগ করার কথা ভাবাই যায় না। জননীকে পরিত্যাগ করার ফল কখনও শুভ হয় না, কখনও হয়নি, আর কখনও হবেও না।

সংস্কৃত ভাষাকে ত্যাগ করলে তো আমরা আমাদের ধারাবাহিকতাকে হারিয়ে ফেলব। শিকড়বিহীন গাছের সজীবতা বজায় থাকে না। আমরা আমাদের তথাকথিত প্রগতিবাদী বিদ্বৎসমাজ উন্নাসিক মনোভাব দ্বারা নিজেরাই নিজেদেরকে আত্মঘাতী হওয়ার পথে ঠেলে দিচ্ছি। কিন্তু শিক্ষিত হয়ে উঠছি না। জ্ঞানচর্চা কখনও ব্যবহারিক মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না। বহু ভাষার সমৃদ্ধিতে আমার দেশ সম্মানিত হোক এই কামনায় ঘরে ঘরে ভাষাচর্চার উৎসাহদান ঘটুক।

ভারতীয় ভাষা চর্চা কখনও সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করে সফল হয়ে উঠতে পারে না। জননীভাষায় সমৃদ্ধ না হয়ে উঠলে পরিভাষার কখনও সমৃদ্ধি ঘটানো যায় না। পরিভাষার নির্মাণকাজই দাঁড়িয়ে আছে সংস্কৃত ভাষার উপর। প্রায় দুই তিন দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির অবোধ অশিক্ষিত ধারণায় ইংরাজির পাশাপাশি সংস্কৃত চর্চার ধারাকেও কার্যত বিলীন করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গ যেমন ইংরেজিতে অজ্ঞতার পথে গেল, সংস্কৃত চর্চাহীন বাংলাশিক্ষাও অতল জলে তলিয়ে গেল।

ভারতের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, দর্শন এমনকী বাংলা ভাষার ইতিহাস, ব্যাকরণ, বানান সমস্ত কিছুতে এককালে যে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল তার পিছনে কিন্তু সংস্কৃত ভাষাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা বিপুলভাবে কাজ করেছিল। তাই সংস্কৃতকে যত দ্রুত পারা যায় আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

বর্তমনে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেশের সি বি এস ই স্কুলগুলিতে (৭-১৩ আগস্ট ২০১৪) 'সংস্কৃত সপ্তাহ' পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, যা অত্যন্ত জরুরি। বাংলা ভাষার প্রতিটি মানুষকে মনে রাখতে হবে সমস্ত বিদ্যা-সহ বাংলা ভাষার ব্যাপক উন্নতি করতে হলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করা আবশ্যক। সংস্কৃতের সামগ্রিক জ্ঞানকে স্বাগত জানালেই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে।

—অমিত ঘোষদস্তিদার
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

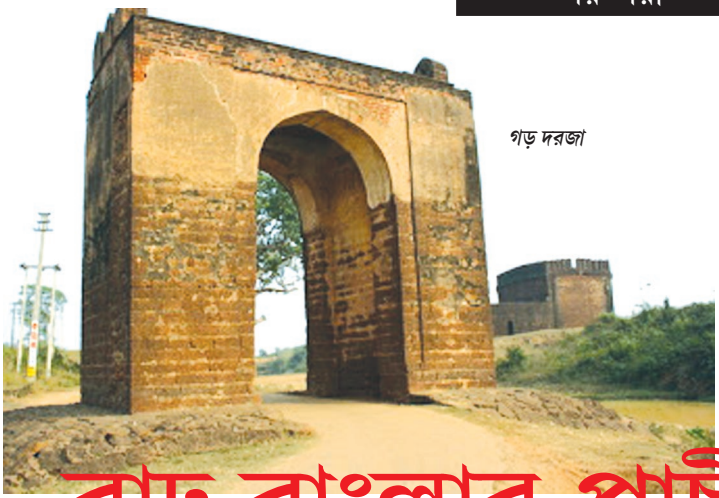

গড় দরজা

রাঢ় বাংলার প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বিষ্ণুপুর

প্রশান্ত কুমার মণ্ডল

পর্ব—২

মধ্যরাঢ় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর জনপদ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক পর্যটন কেন্দ্র। সারা বছর ধরে দেশবিদেশের পর্যটক ও ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুর ভিড় লেগেই থাকে। মল্লরাজাদের কীর্তিগুলির বেশিরভাগই সরকারের তত্ত্বধানে আছে।

গড়দরজা : মল্লভূম রাজ্যের রাজদরবারের দুইটি প্রধান প্রবেশদ্বার (ছোট ও বড়) গড়দরজা নামে পরিচিত। দরজাদু'টি সপ্তদশ শতাব্দীতে বীরসিংহের আমলে নির্মিত পাথরের দ্বারা বিশেষ গঠনশৈলীর মাধ্যমে নির্মিত। এই গড়দরজা তোরণের মতো। প্রধান প্রবেশদ্বারে শত্রু নিধন করার জন্য রাজার এক নবতম কৌশল। এখানে সৈন্যরা আত্মগোপন করে বর্গীর হাঙ্গামা বা অন্য কোনো বহিঃশত্রুর আচমকা আক্রমণ এড়ানোর জন্য রাজধানীর প্রবেশদ্বারে মোতায়েন থাকত। তাছাড়া অন্যান্য বহিঃশত্রুর অতর্কিত হাঙ্গামা রোধ করার জন্য শহরের চতুর্দিকে পরিখা বা খাল খনন করে জলপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। এখন গড়দরজা ও পরিখার জীর্ণদশা রাজদরবারে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়।

শ্যামরায় : ১৬৪৩ খৃস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন রাজা রঘুনাথ সিংহ (১ম)। পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট ইটের তৈরি রত্নমন্দিরগুলির মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত। এর মন্দিরটির আকর্ষণীয় চিত্র হলো পূর্ব দেওয়ালের গাত্রে রামায়ণ বিষয়ক টেরাকোটা। পশ্চিম দেওয়ালের গাত্রে আছে রাসমণ্ডল, উত্তর দেওয়ালের গাত্রে যোদ্ধামূর্তি ও রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা বিষয়ক বিভিন্ন দৃশ্যের মূর্তির সারি। এই মল্লরাজের আমলে পূর্ব নির্মাণশৈলী জোড়বাংলা এবং কালাচাঁদ জিওয়ের মন্দিরও তৈরি হয়।

জোড়বাংলা : ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ এই মন্দির নির্মাণ করেন। অন্যান্য জোড়বাংলার মতো দুইটি চালা পরস্পর একত্রিত করে মাঝখানে একটি চারচালা চূড়া বসিয়ে এক চমৎকার শিল্পরূপময় স্থাপত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই টেরাকোটা অন্যান্য মন্দিরগুলির চেয়ে আকারে বেশ বড়। মন্দিরের গাত্র আবরণে রামায়ণের রাম ও রাবণের যুদ্ধ, দেবদেবী ও দানবের যুদ্ধ, কৃষ্ণ-বলরামের অসুর বধ, কংসবধ এবং মহাভারতের যুদ্ধ ও কৃষ্ণের বাল্যলীলার চিত্রসজ্জার এক অনবদ্য শিল্পকলা। এই মন্দিরটি রাজদরবারের নিকট পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। মন্দিরটি বর্গাকার এবং উচ্চতা প্রায় সাড়ে দশ মিটার।

রাধাবিনোদ : ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে বীরসিংহদেবের আমলে তৈরি হয়। এই মন্দিরের টেরাকোটার কাজ অতি নগণ্য। রাম-রাবণের যুদ্ধ ও গোষ্ঠলীলার প্রতিমূর্তি আছে।

শ্রীধর মন্দির : বিষ্ণুপুর শহরের বিভিন্ন পল্লীতে এই ধরনের মন্দির দেখা যায়। নয়টি চূড়া বিশিষ্ট টেরাকোটার রামরাজা বা রাসলীলা ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার চিত্র টেরাকোটায় বিশেষভাবে দর্শনীয় রূপে প্রকাশ পায়।

রাসমঞ্চ : ১৭ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বীর হাম্বির নামে এক মল্লরাজ এই রাসমঞ্চ নামক চত্বরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি কৃষ্ণপূজার অঙ্গ হিসেবে বিশেষ ভাবে দোল ও রাসপূর্ণিমার উৎসবের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাসমঞ্চ মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারির আদলে তৈরি। ওই বিশেষ দুই তিথিতে মূল মন্দির থেকে আনা হয় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। প্রচলিত স্থাপত্যশৈলী বহির্ভূত সৌধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভিনব নিদর্শন। মল্লরাজাদের এই অপূর্ব নির্মাণশৈলী বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্য কোনো স্থানে দুর্লভ।

সপ্ত সরোবর : রাজা বীর হাম্বির রাজ্যভার গ্রহণ করার পর বিপুল অর্থ ব্যয়ে বিষ্ণুপুর প্রজাবাসীর সুবিধার জন্য ৭টি বড়ো বড়ো বাঁধ (সরোবর) খনন করান। এই বাঁধগুলি হলো কৃষ্ণবাঁধ, লালবাঁধ, গাঁতাত বাঁধ, যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যামাবাঁধ ও পোকাবাঁধ। এই সপ্ত সরোবরের মধ্যে কৃষ্ণবাঁধটি আয়তনে সবচেয়ে বড়ো। দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল।

মদনমোহন মন্দির : এই মন্দিরটি তৎকালীন মল্লরাজ দুর্জন সিংহদেব ১৬৯৪ খৃস্টাব্দে তৈরি করান। ল্যাটেরাইট পাথরের দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটিতে আকর্ষণীয় টেরাকোটায় রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধ

সম্বলিত দৃশ্য এবং জন্মাষ্টমীর ঘটনা, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দৃশ্য ছাড়া রয়েছে মনোরম অপূর্ব হংসলতা।

মা-মৃন্ময়ী : মল্ল রাজকুলের বহুকালের উপাস্য দেবী পরমাশক্তি মা 'মৃন্ময়ী'। ৯৯৭ খৃস্টাব্দে বাংলা ৪০৪ সালে মহারাজা জগৎ মল্ল প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন ওই স্থানটি ছিল গভীর অরণ্যবহুল। শোনা যায়, বিষ্ণুপুরের প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে এই মৃন্ময়ী মায়ের অবদান। নন্দী-ভৃঙ্গীসহ ভূতনাথ একটি চালার দুই পার্শ্বে বিরাজ করছে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে 'মহিষমর্দিনী' মূর্তি।

মা-ছিন্নমস্তা : বিষ্ণুপুরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করলেও আরও একটি কিংবদন্তী মন্দিরের কথা যদি উল্লেখ করা না যায় তাহলে অপূর্ণই থেকে যায়, তা হলো 'শ্মশান কালী'র মন্দির। এই মন্দিরটি সাধক বামাক্ষ্যাপার আদেশানুসারে তৈরি হয়েছে। এখানে ছিল বহু পুরাতন শ্মশান। শোনা যায় এক কাপালিক মহাশ্মশানের অনুসন্ধান করতে করতে এই স্থানটি নির্বাচন করেন। ওই কাপালিক নিজের তাজা রক্ত দিয়ে মা-ছিন্নমস্তার প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপুরের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় এটা গুপ্ত সাধনার জায়গা। ওই শ্মশানে আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিহিত আছে— পতিঘাতিনী চন্দ্রপ্রভার কথা।

দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের তিন পত্নী ছিল— প্রথমটি রাজলক্ষ্মী, দ্বিতীয়টির নাম কেউই জানে না এবং তৃতীয়টির নাম ছিল 'চন্দ্রপ্রভা'। প্রথম দিকে তৃতীয় পত্নী চন্দ্রপ্রভা ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক অযথা ক্ষমতা প্রদর্শক, কঠোর ভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাহক। তিনিই অতি অনায়াসে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে মেনে নিয়েছিলেন। অতি সহজেই কুল-পুরোহিতের নির্দেশে নিজ স্বামীকে হত্যা করে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। কারণ তিনি নিজেই অনুভব করতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামী রঘুনাথ সিংহ সঙ্গীত নিপুণা ও রূপসী লালবাঈ-এর মোহে আকৃষ্ট হয়ে বিষ্ণুপুরকে বিকিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছেন, তখন তিনি ওই কাজ করে বিষ্ণুপুর প্রজাবাসীদের শোষণের হাত থেকে রেহাই করেন। এই মহিয়সী নারী তাঁর নিজ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে

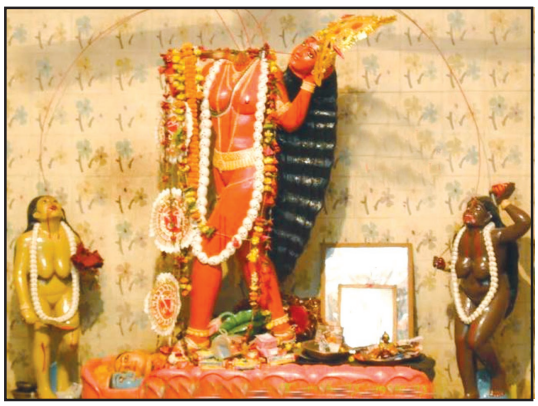

মা ছিন্নমস্তা

দিয়েছিলেন আগে দেশপ্রেম, পরে স্বামীর প্রতি প্রেম। তাই তাঁকে পতিঘাতিনী 'সতী চন্দ্রপ্রভা' বলা হয়।

আবার অনেকে মনে করেন রাজলক্ষ্মীদেবী চলে যাওয়ার পর বিষ্ণুপুর রাজপরিবার ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। হতে পারে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের হত্যার পর রাজলক্ষ্মী বিপদ বুঝে পুত্রদের নিয়ে বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যান।

তারপর শুরু হয় সপ্তদশ শতক। রঘুনাথ সিংহের মৃত্যুর পর ১৭২২ খৃস্টাব্দে রাজা হন গোপাল সিংহদেব। তিনি পরম ভক্তিমান ধর্মপ্রাণ পুরুষ ও সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন। কথিত আছে তিনি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই শতকের মাঝামাঝি থেকে মল্লরাজ সৌভাগ্য রবি অস্তাচলগামী হয়। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন রাজার কৃতকর্ম ও দূরদর্শিতার অভাবে একের পর এক বিপর্যয় নেমে আসে। বর্গীর হাঙ্গামা এবং পার্শ্ববর্তী বর্ধমানের মহারাজা 'কীর্তিচাঁদ' বিষ্ণুপুরের দিকে ক্রমাগত আক্রমণ করে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের জমিদারির এক্তিয়ারভুক্ত করেন। তারপর অপ্রতিরোধ্য মারাঠা শক্তির অত্যাচারে বিষ্ণুপুর রাজবংশের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়। অপর দিক দিয়ে বিচার করলে জানা যায় বৈষ্ণবধর্মের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিকে মল্লভূম রাজত্বকে আরও বিমর্ষ করে তোলে।

১৭৩০—১৭৪৫ খৃস্টাব্দ তৎকালীন রাজা গোপাল সিংহ এক আদেশ জারি করেন। প্রত্যেক প্রজাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ হরিনাম জপ করতে হবে। উপহাস করে তখনকার লোকেরা বলতেন 'গোপালের বেগার'।

রাজা গোপাল সিংহদেবের মৃত্যুর পর তাঁরই পৌত্র চৈতন্য সিংহদেব ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে (১০৫৪ মল্লাব্দ) সমারোহে পিতামহের রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন। সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর খাঁ বিষ্ণুপুর রাজ্যের অর্ধাংশ দাবি করলে মহারাজ চৈতন্য সিংহের পিতৃব্যপুত্র দামোদর সিংহ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নালিশ করেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিকার করতে গিয়ে চৈতন্য সিংহদেব নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তিনি কোনোরূপ পথ খুঁজে না পেয়ে অষ্টধাতু নির্মিত প্রাণের ঠাকুর কুলদেবতা মদনমোহন বিগ্রহকে কলকাতার বাগবাজারস্থিত তৎকালীন ধনশালী ব্যক্তি গোকুল মিত্রের কাছে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে বন্ধক রেখে দেন। এই রাজার মতো বিষ্ণুপুর মল্লরাজ বংশের কোনো রাজা এত দুঃখ ও দুর্দশাপূর্ণ ছিলেন না। তিনি (১৭৪৮— ১৮০১) ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র মদনমোহন সিংহদেব মারা যাওয়ার পর তাঁর পৌত্র মাধব সিংহদেবকে ১৮০১ খৃস্টাব্দে বিষ্ণুপুর মল্লরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তিনি ১৮০২ খৃস্টাব্দে মারা যান। এরপর আর এক মল্লরাজ সিংহদেব বাঁকুড়া সদর ট্রেজারি লুণ্ঠন করার ষড়যন্ত্রের দায়ে কোম্পানির ফৌজের হাতে বন্দী হন। ১৮২৯ খৃস্টাব্দে তিনি কলকাতার জেলে বন্দী অবস্থায় মারা যান।

এরপর তাঁর পুত্র গোপাল সিংহদেব রাজা হন। পরপর রাজবংশের অনেক রাজা রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু বিপর্যয়ের বাধা কেউই শক্ত হাতে দমন করতে পারেননি— স্বভাবই পরাক্রমী বীর রাজতন্ত্র

কালের গ্রাসে চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে, অনেক মূল্যবান সম্পত্তি ১৮১৬ খৃস্টাব্দে ১২ নভেম্বর নিলামে বিক্রয় হয়েছে। সেই সুযোগে তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব বেশ কিছু অংশ কিনে নেন।

কোনো রাজত্ব যখন চরম অশান্তি ও অব্যবস্থার মধ্যে পর্যবসিত হয়, তখন অনেক কারণ স্বভাবতই এসে পড়ে। অবশেষে মোগল রাজত্বের শেষের দিকে ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৭৪৪ খৃস্টাব্দের পর থেকে বিষ্ণুপুর মল্লসেনাদের চেষ্টাও কম ছিল না। অতর্কিত মারাঠাদের আক্রমণ (বর্গীর হাঙ্গামা নামে খ্যাত) বিষ্ণুপুর মল্লরাজ্য এক কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই আক্রমণকে ছড়ায় অনেকে বলতেন 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে— বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে'। মল্লভূমরাজ্যও তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানের মানুষরা নিঃস্ব হয়েছে। খাজনা দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। বর্গীর আক্রমণ ঠেকাতে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের কাহিনী যা ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজাদের ইতিহাসের এক অন্যতম দলিল। বিষ্ণুপুর মল্লভুম রাজত্বের ইতিহাস এক পৌরাণিক হিন্দু রাজত্বের ইতিবৃত্ত যা বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের এক জীবন্ত নিদর্শন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে গোলন্দাজ বাহিনীর 'দলমর্দন' কামান দাগার দায়িত্ব কার হাতে দেওয়া হয়েছিল তা বিশিষ্ট তিনজন ব্যক্তিই জানতেন। মহামন্ত্রী পীতাম্বর পাত্র, সেনাপতি রঘুনাথ সিংহ এবং যুবরাজ কৃষ্ণ সিংহদেব। তার মধ্যে যুদ্ধে মারা যান কৃষ্ণ সিংহদেব। বিষ্ণুপুরের সকল প্রজাবাসীর উদ্দেশ্যে ১৬ বৎসর বয়সী কিশোর মদনমোহন কর্মকার দুইটি কামান দাগলেন। কামান দিয়ে শত্রু মর্দন করেছিলেন বলে এই কামানের নাম 'দলমর্দন' বা 'দলমাদল' কামান নামে পরিচিত। ৬৩টি লোহার বেড়ি বা অংশ পেটাই করে তৈরি করা হয়েছে কামানটি। কামানটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে ১২ ফুট ও মুখের ব্যাস প্রায় ১ ফুট। সম্পূর্ণ খোলা আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও ওই কামানটিতে আজও কোনো মরিচা ধরেনি। এই কামানটি বর্তমানে 'মা-ছিন্নমস্তা' মন্দিরের সন্নিকটে সংরক্ষিত আছে। আরও একটি কামানের কথা শোনা যায় কোনো পুকুরের মধ্যে আছে।

বহিঃশত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য ও সঙ্কেত আদান প্রদানের জন্য ৬-১০ মাইল দূরত্বে পূর্ব থেকে পশ্চিমে উঁচু স্তম্ভ বা মাচান তৈরি করা হয়েছিল। এই মাচানের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায় জয়পুর, রামসাগর, টোকিমুড়া, মাচানতলা, ছাতনা প্রভৃতি স্থানে। এই মাচানেরই অবস্থানের জন্য বাঁকুড়া শহরের এক অংশের নাম মাচানতলা হয়েছে।

ইতিহাসের নিয়মই কোনো রাজত্বই চিরস্থায়ী হয় না। সেই সূত্র ধরেই রাজা চৈতন্য সিংহের আমলে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। রাজদণ্ড ধরে রাখার জন্য কোনো সুযোগ্য মল্লরাজ আর পারেনি, অবশেষে ১৯৩০ খৃস্টাব্দে মল্লরাজা হন কালীপদ সিংহ ঠাকুর। তিনি ১৯৮৩ খৃস্টাব্দে মারা যান।

এখনও বহুগুণীজন ধরে রেখেছেন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক লাল কাকুরে মাটির বিগত ইতিহাস বিজড়িত নানান নিদর্শন। নানান অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে বিভিন্ন কাগজ। ভারতবর্ষের রাঢ় অঞ্চলের কথা পর্যালোচনা করলে বেরিয়ে আসবে বাঁকুড়া জেলা তথা মধ্য রাঢ় ভূমির নাম--- মল্লরাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুরের নাম। তাছাড়া পটে চিত্রিত আছে বিভিন্ন সময়ের মনোরম রেখাচিত্র। কিন্তু মল্লরাজধানীর স্মৃতি বিজড়িত বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহর সরকারি বিশেষ কোনো পরিকাঠামোর অভাবে হয়তো শেষ হয়ে যাবে জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়া মনোরম দৃশ্যসুলভ প্রাচীন নীরব ঐতিহ্য। শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে সংগ্রহশালার নথি।

ইতিহাসের গতি কোনোদিনই স্তব্ধ হয়ে থাকে না। বিভিন্ন মল্লরাজারা রাজ্যভার গ্রহণ করার পর সাধ্যমতো প্রজাপালনে ব্রতী হয়েছেন। তাদের সৃষ্ট মল্লভূমের ভগ্নমন্দিরগুলির দিকে তাকালে অনেক কথা, অনেক ব্যথা, অনেক ইতিহাস শোনা ও দেখা যায়। শোনা যায় একদা বিশাল মল্লভূম সাম্রাজ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে রক্তঝরা প্রহরের মল্লরাজাদের কীর্তি কাহিনী। নমস্য দুই মাতৃমঙ্গলময়ী এখনও আছেন— একদা মল্লভূম রাজধানীর একদিকে 'মা-মৃন্ময়ী এবং অপর দিকে— 'মা-ছিন্নমস্তা'। আজও তাঁরা নিত্য পূজিতা।

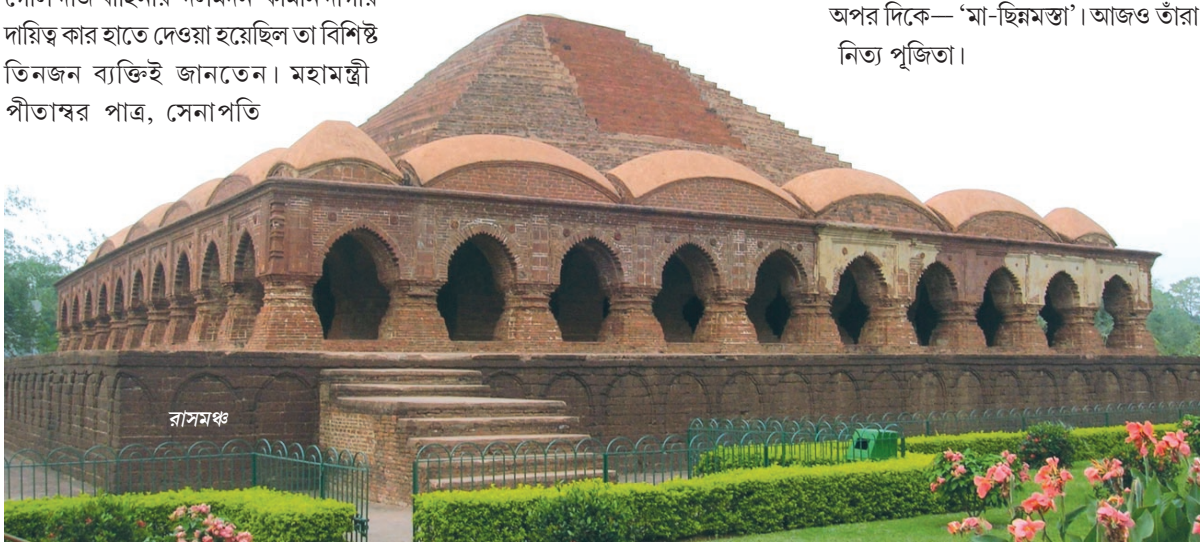
রাসমঞ্চ

চিরদিনের লেখা

নবাঙ্কুর

আজ কি দেবে তুমি দেশকে?

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, এর চেয়ে বড় সত্য কথা আর কিছু নেই। এবং এই স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারটা আজ তোমাদের মন থেকে ভালো করে বুঝতে হবে। এদেশ আমাদের। এর লজ্জা আমাদের। এর ত্রুটি আমাদের। এর দৈন্য আমাদের। এর অভাব আমাদের। এই ত্রুটি আর দৈন্যকে আমি বলছি না যে তুমি চোখ বুজে মেনে নাও, কিছু এই দৈন্য আর ত্রুটির বিরুদ্ধে আজকে যদি তোমাদের লড়তে হয়, তাহলে তার রীতি হবে আলাদা।

তাই আজকে আমাদের সমস্ত সংগ্রামের পেছনে থাকা চাই একটা দরদ, একটা ভালোবাসা। আপনার লোককেও দরকার হলে আঘাত করতে হয়। কিন্তু তখনি সেই আঘাত সার্থক হয় যখন তাকে আঘাত করতে গিয়ে আমাদের মনে সমান বেদনা জাগে। আঘাত করতে গিয়ে মনে যদি সে বেদনা না জাগে, তাহলে জানবে আঘাত করা ভুল হচ্ছে। তাই আজ যে সংগ্রাম করতে হবে, আগে নিজের মনে দেখতে হবে, সেখানে জেগেছে কিনা সেই অসীম ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আঘাত করতে গিয়ে নিজেই সবচেয়ে বেশি আহত বোধ করে। চোখের সামনে যখন দ্যাখো, কেউ রেগে ট্রাম পুড়িয়ে দিল কিংবা বাস পুড়িয়ে দিল, তখন কি মনে তুমি সেই বেদনা অনুভব করো? অনুভব করো কি যে, তোমার নিজের জিনিসই পুড়ে যাচ্ছে?

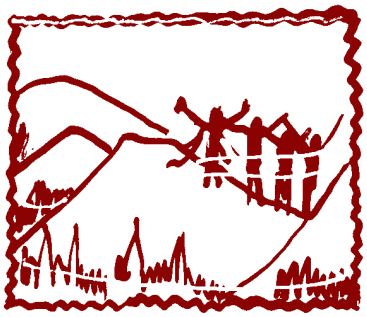

তোমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তোমাদের মনে জাগ্রত হোক, তোমাদের নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। এই মাটিতে পা ফেলতে তোমার দেহ যেন শিউরে ওঠে, এই মাটির অনুভবে। এই বাতাস নিঃশ্বাসে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অনুভব কর, এই বাতাস বয়ে আনছে তোমার ক্ষুদিরাম, তোমার প্রফুল্ল চাকী, তোমার বিবেকানন্দ, তোমার রবীন্দ্রনাথ, তোমার দেশের অযুত বীরের দেহের সুরভি বহন করে। প্রতিদিন নিজের নিভৃত ঘরে, অন্তত কয়েক মিনিটের মতোন চোখ বুজে অনুভব করতে চেষ্টা করো, যে-মানুষ মায়ের কোলে জন্মেছে, তেমনি বসে আছে এই মাটির কোলে : তার জীবন্ত দেহের নিঃশ্বাস তোমার চোখে মুখে কেশে এসে লাগছে। এক মুহূর্তের জন্যে তুমি আর তোমার দেশ হয়ে গিয়েছে এক। তারপর বলে দিতে হবে না তোমার কর্তব্য কি!

আজ সংগ্রামের দিন নয়, আজ গড়ে তোলবার দিন। আজকের দিনের দাবি সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো কিছু করবার আগে তাই কান পেতে ভালো করে শোন, আজকের দিনের কি দাবি তোমার ওপর! তোমাকে যদি কেউ জল আনতে বলে, তুমি তা কানে না শুনে যদি কাপড় এনে দাও, তাতে তো কোনো কাজ হবে না। তাই আজ তোমাকে জানতে হবে, তোমার দেশ তোমার কাছে কি চাইছে, তবেই তো তোমার দেওয়া সার্থক হবে! তবেই তো তোমার পরিশ্রম সফল হবে।

আজ তোমার দেশ তোমার কাছে কি দাবি করছে, কোন জিনিস তোমার দেশকে দিলে সে ধন্য হয়ে যাবে, সেই কথাই আজ অন্তর থেকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে।

যখন সেই দাবির অনুযায়ী দেশকে দিতে পারবে, তখনই দেখবে তোমার জীবন ধন্য হয়ে উঠেছে, তোমার মায়ের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠেছে।

সংকলন : কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

স্কুলে বই প্রদর্শনী

পড়ার জন্যে রোজ কিছুটা সময় রাখার কথা সকলকে বলতেন মুকুল স্যার। স্কুলে সপ্তর্ষিদের ইতিহাস পড়াতেন। কত সহজ করে সব বুঝিয়ে দিতেন। গল্পের মতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। তাঁর ক্লাসে কেউ ফাঁকি দিত না। অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী পড়িয়েছেন ক্লাসে। ছবির পর ছবি কল্পনা করে নিতে পেরেছিল সপ্তর্ষিরা। ইতিহাসের অন্য বিষয় পড়ানোর সময় প্রয়োজনীয় বইপত্র দেখে নিতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প বলতেন ছেলেদের। ইতিহাস তো অনেক কথায় ভরা। ঠিক ভাবে বলার দরুন সকলেই বুঝে যেত ভালোভাবে।

স্কুলে বইয়ের প্রদর্শনী হোত পুজোর ছুটির আগে। মুকুল-স্যার প্রধান ভূমিকা নিতেন। সকলকে বলা হোত, তোমার পছন্দের যে কোনো একটা বই অন্তত কিনবে। কিছু বইয়ের দাম বেশি থাকলেও অনেক বইয়ের দাম কম। একসঙ্গে অনেক বই দেখার মজা যথেষ্ট। বই আনা হোত বেছে। প্রকাশকরা ধারে বই দিতেন। তাঁদের সঙ্গে আগেভাগে কথা বলা থাকত, বই বিক্রির পর হিসেব করে টাকা দেওয়া হবে। আর যেসব বই বিক্রি হবে না তা ফেরত পাঠানো হবে তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে। কোনো বছরেই বই ফেরত দিতে হয়নি। প্রকাশকরা সেজন্যে খুশি। প্রদর্শনী খুব সুন্দরভাবে সাজানো হোত। বই নিয়ে বিখ্যাত মানুষরা যেসব কথা বলেছেন তার থেকে বাছাই করা কয়েকটি ব্যবহার হোত। বই হাতে নিয়ে দেখার পূর্ণ স্বাধীনতা পেত ছোটোরা। কেউ বারণ করতো না। স্কুলের বই প্রদর্শনী থেকে প্রতিবছর বই কিনেছে সপ্তর্ষি। যেসব বই যত্নে রয়েছে। মুকুল-স্যার অন্য স্কুলে চলে যাওয়ার পর একটা বছর এই প্রদর্শনী হয়েছিল। তবে তার মধ্যে প্রাণের ছোঁয়া থাকেনি।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. টেকচাঁদ ঠাকুর কোন্ লেখকের ছদ্মনাম? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে? তাঁর লেখা বিখ্যাত বইয়ের নাম?

২. নীলচাষ নিয়ে লেখা নাটকের বইয়ের নাম কি? লেখকের নাম?

৩. রবীন্দ্রনাথের পিতামহের নাম?

৪. রাধানাথ শিকদার কোন্ কাজের জন্যে চিরস্মরণীয়?

৫. 'সীতার বনবাস' কে লিখেছেন?

উত্তর : ১. প্যারীচাঁদ মিত্র। ২২ জুলাই ১৮১৪, ২৩ নভেম্বর ১৮৮৩। আলালের ঘরের দুলাল। ২. নীলদর্পণ। দীনবন্ধু মিত্র। ৩. দ্বারকানাথ ঠাকুর। ৪. এভারেস্টের উচ্চতা মাপা। ৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ছবিতে তফাত খোঁজা

চিরদিনের পাঠ

মা আমার

কামিনী রায়

(১৮৬৪-১৯৩৩)

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি— মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিত তব কাজে,
ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ-কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়,
গাহি যদি কোনো গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, কাঁদিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক প্রাণ, যাক মান— মা আমার। মা আমার।

বাসন্তী

রিনিশা রায়

বর্তমান সমাজে অনেক পরিবার আছে সেখানে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। কন্যা সন্তান মানেই দায় আর পুত্র সন্তান লাভজনক— এমন একটা প্রাচীনপন্থী ভাবনা বহু মানুষের মজ্জায় মিশে আছে। তাই এখনো কোনো কন্যাসন্তানের মাকে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। এমনকী পরপর কয়েকটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়া মাকেও স্বামীর সংসার থেকে পরিত্যক্তা হওয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। অর্থাৎ এই যে লিঙ্গ বিভেদ তা আজও আমাদের আধুনিক সমাজে বিদ্যমান। আর শিশুকন্যাটি যদি প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। গর্ভে থাকাকালীন ভ্রূণ হত্যাও প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে এদেশে। যদিও শিশুকন্যার ক্ষেত্রেই এমনটা বেশি হয়।

এরকমই একটি মেয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েই জন্ম নিয়েছিল ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে। জন্ম থেকেই দু'টি হাত তার নেই। জন্মের পর থেকেই তার মাকে পোয়াতে হয়েছে হাজারো লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। তার পরিবারের কাছে এমন প্রস্তাবও এসেছিল শিশুকালেই তাকে বিনাশ করে দেওয়ার। যুক্তি ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েকে লালনপালন করে লাভ কি? তার মা সে কথায় কান দেননি বলেই হয়তো আজ রোজ দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করে পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে মেয়েটি। বাসন্তী সমস্ত প্রতিবন্ধকতা জয় করে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও পথটা খুব একটা মসৃণ ছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছে। জয়ের মন্ত্র উচ্চারণের পাশাপাশি প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়ে সফল হওয়ার পন্থা করায়ত্ত করেছে এই অপরাজিতা।

হাতহীন মেয়েটিকে সবকিছুর জন্যই অন্যের উপরই নির্ভর করে থাকতে হতো। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা জাগে। বাবা-মা তার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে অক্ষম। কারণ তার তো হাত নেই লিখবে কি করে। তার অতি আগ্রহের বাবা-মা তাকে স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকেই শুরু হলো বাসন্তীর সংগ্রামের পথে চলা। সেই সঙ্গে শুরু হয় মেয়েকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা। হাত না থাকা সত্ত্বেও দমে যায়নি মেয়ের লেখাপড়া করার ইচ্ছা। পা দিয়েই শুরু করে লেখা। বাসন্তী প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে পা দিয়ে লেখার অভ্যাস করত। এরপর বইয়ের পাতা উল্টানো থেকে খাতায় লেখা, খাওয়া দাওয়া সবকিছু পা দিয়েই চলতে থাকে। একের পর এক ক্লাস উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৯৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে এই অপরাজিতা। আর তখন থেকেই সে গৃহশিক্ষকতা করতে শুরু করে। বর্তমানে বাসন্তী রোদাবান্ধ সেকেন্ডারি স্কুলের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক (প্যারাটিচার) এবং সেই সঙ্গে গৃহশিক্ষক। স্কুলে ক্লাস নেওয়ার সময় বাসন্তী খুব সহজেই দেওয়ালে টাঙ্গানো ব্ল্যাকবোর্ডে পা দিয়ে লিখতে পারেন। বাসন্তীর কথায়, ''যখন ২০০৫-এ আমি স্কুলে অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি তখন বোর্ডে লিখতে সমস্যা হোত। কিন্তু পরে এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জে পরিণত হলো। শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত অভ্যাস করতে হোত।''

হাত নেই বলে প্রতিবন্ধকতা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। বরং বেশি সাবলীল বলেই এখন মনে হয় বাসন্তীকে। ব্ল্যাকবোর্ডের পাশাপাশি ছাত্রদের খাতাতেও একই পন্থা অবলম্বন করে অবলীলায় লিখে যান। বর্তমানে বাসন্তীর বাবা বৃদ্ধ। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেলেও বাসন্তীর ঘাড়েই পরিবারের অন্ন জোগানোর ভার রয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও হার মানতে নারাজ। লড়াই করে বড় হয়েছেন বাসন্তী, আগামী দিনেও লড়াই করেই বাঁচতে চান। জন্মানোর পরে যারা মেরে ফেলার কথা বলেছিল আজ তারাই বাহবা দিচ্ছে এই হার না-মানা মেয়েটিকে। আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কাছে তাই প্রেরণাস্বরূপ বাসন্তী। ■

মৌলবাদের বিষবৃক্ষ

অতিথি কলম

বলবীর পুঞ্জ

গত সোমবার (২৮.৭.১৪) রাজ্যসভায় ইজরায়েল ও ফিলিস্তিন (প্যালেস্টাইন)-এর 'হামাস'দের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে সেই বিষয়ে কিছু বিরোধী সদস্য সরকারের প্রতি উদাসীনতার অভিযোগ আনেন। তখন কিছু কম্যুনিস্ট সদস্য 'সরকার ইজরায়েলের পক্ষ নিয়েছে'— এই মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা করে। বিরোধীরা প্রস্তাবের মাধ্যমে ইজরায়েলের কাছে যুদ্ধ বিরতির আবেদন করার দাবি জানান। এই দাবিকে অস্বীকার করে সরকার স্পষ্টরূপে বলে— ভারতের বিদেশনীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং সরকার ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে ইজরায়েলের সঙ্গেও সম্বন্ধ বজায় রাখার নীতিই গ্রহণ করেছে। গত ৮ জুলাই থেকে ইজরায়েলের 'অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজ' 'হামাসে'র হঠকারী নীতিরই ফল। 'হামাস' ইজরায়েলি এলাকায় শতাধিক বোমা বর্ষণ করে ইজরায়েলকে অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করেছে। 'হামাস' ফিলিস্তিনের গাজার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাঙ্কার, রকেট লঞ্চার ইত্যাদি স্থাপন করে রেখেছে। ওই সমস্তগুলি সাফ করার জন্য ইজরায়েল ফিলিস্তিনের জনবহুল এলাকায় হামলা চালাতে বাধ্য হয়।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে এবং সুন্নি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'হামাস'-কে যেসব বুদ্ধিজীবী সমর্থন করছেন অর্থাৎ এই বিষবৃক্ষে জল সিঞ্চন করছেন যার আঘাতে কেবল অমুসলমান দেশগুলিই আহত হবে এমন নয়, অনেক মুসলমান দেশও ইসলামী কট্টরবাদের বিপদের শিকার হবে। যে সকল ইসলামী দেশ শরিয়তকে পুরোপুরি মেনে চলে না এবং উদার ও আধুনিক ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়াস চালাচ্ছে 'হামাস' তাদের ঘোর বিরোধী। সদ্য সদ্য আফগানিস্তানের একটি ঘটনা সামনে এসেছে। এক মৌলবি মসজিদের ভিতরে ১০ বছরের ছোট এক বালিকার সঙ্গে দুষ্কর্ম করে। ফলস্বরূপ বালিকাটি হাসপাতালে ভর্তি হয়। শিশু অধিকার রক্ষার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ওই বালিকাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ন্যায্য বিচার পাওয়ার পদক্ষেপ নেওয়ায় এক মৌলবি ওই বালিকাকে 'নিকাহ' করতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু পরিবারের লোকেরা 'অনার কিলিং'-এর নামে ওই বালিকাকে হত্যা করার কথা বলছে, শিশু অধিকার রক্ষার কার্যকর্তারা কট্টরপন্থীদের হুমকি পাচ্ছে। বালিকাটিকে সুরক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ তাকে পরিবারের লোকেদের হাতে দিয়ে দিয়েছে। এখন ভগবানই তার ভরসা। আমরা কি সভ্য সমাজের স্থলে এই ধরনের ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য 'হামাসে'র মতো কট্টরপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে বাঁচাবার চেষ্টা করব? ইজরায়েল ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর সংলগ্ন মধ্যপূর্বে অবস্থিত --- লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন ও গ্রীস বেষ্টিত এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ইসলামী দেশগুলির কাছে প্রথম থেকেই ইহুদিরাষ্ট্র ইজরায়েল গলার কাঁটা। ইরানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আহমদী নেজাদ প্রকাশ্যে ইজরায়েল রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। 'হামাসে'রও ঘোষিত লক্ষ্য একই।

হামলার জন্য প্রস্তুত হামাস জঙ্গিবাহিনী।

১৯৪৮ সালে এক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ফিলিস্তিন ও মধ্য পূর্বে সক্রিয় অন্য আরও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বিভিন্ন আরবদেশের থেকে অস্ত্র ও অর্থ পেয়ে সে ইজরায়েলের উপর হামলা চালাচ্ছে। সিরিয়া ও ইরানের মতো আরব দেশগুলি 'হিজবুল্লা'র মতো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর

সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যার মধ্যে 'হামাস' এবং 'ইসলামিক জিহাদ'ও রয়েছে। সিরিয়াতে তাদের প্রধান কার্যালয়। কিন্তু অবিরত আক্রমণ সত্ত্বেও ইজরায়েল কেবল যথাযথ প্রক্রিয়ায় তার প্রতিকারই করেনি বিশ্বে সম্মানপূর্ণ অবস্থান কায়েম করতেও সফল হয়েছে।

কমিউনিস্ট ও তাদের সেক্যুলার সঙ্গীরা সরকারের উপর উদাসীনতা বা একচোখোমির অভিযোগ আনছে। ওদের স্মরণ করানো প্রাসঙ্গিক হবে যে ১৯৭২ মিউনিখ অলিম্পিকে ক্রীড়ানগরীতে ফিলিস্তিনির সন্ত্রাসবাদীরা প্রবেশ করে ইজরায়েলি খেলোয়াড়দের হত্যা করে। ১৯৭৪-এ আরবের সন্ত্রাসবাদীরা এক ইজরায়েলি বিদ্যালয়ে ২১ জন ছাত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তখন ইন্দিরা সরকার ও তাকে সমর্থনকারী মার্কসবাদীরা ওই জঘন্য হত্যাকারীদের কঠোর শব্দে নিন্দা করার স্থলে ফুসুর ফুসুর করাই বেশি পছন্দ করেছিল। এর আগেও দু'বার আরবদেশগুলি সমস্ত ইহুদিদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করার ঘোষণা-সহ ইজরায়েল আক্রমণ করে। কিন্তু তখন দিল্লীর কংগ্রেস সরকার বিরোধিতা না করে আক্রমণকারীদের উৎসাহ প্রদান করে। ইজরায়েল একক শক্তিতে ওই তেরো দেশের আক্রমণের মোকাবিলা করে তাদের পরাস্ত করতে সফল হয়। ইজরায়েলের কঠোর প্রতিরোধে একসময় তাদের সেনা কায়রোর দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়াকে এগিয়ে এসে তেল আবিবকে সরে আসতে রাজি করাতে হয়। সেটা ১৯৭৯ সাল যখন মিশর ইজরায়েল আক্রমণ করেছিল। ইতিহাসে সেটা 'ইউম কিপুর যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এই 'ইউম কিপুর যুদ্ধে'র একটা ফল এটা হয় যে তদানীন্তন মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত বুঝতে পারেন যে ইজরায়েলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়া ভুল। এই কারণেই তিনি ইজরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করে সন্ধি করেন। কিন্তু আরবের সন্ত্রাসবাদীরা খুব শীঘ্র আনোয়ার সাদাতকে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দেয়। তখন থেকেই কায়রো ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়াই করছে।

জওহরলাল নেহরুর সময় থেকেই ভারতের বিদেশ-নীতিতে সাম্যবাদীদের প্রভাব রয়েছে। ১৯৭৮ এ ইজরায়েলি রাষ্ট্রপতি বিদেশ ভ্রমণে এলে তৎকালীন জনতাপার্টি সরকার ঔপচারিক শিষ্টতানুসারে দিল্লী বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানায়। কমিউনিস্টরা এর বিরুদ্ধে খুব শোরগোল করে। বামপন্থীদের এই হল্লা তখনই বন্ধ হয় যখন ইজরায়েল প্রমাণ-সহ পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে যুদ্ধে তেল আবিব ভারতকে যে সাহায্য করে তা প্রকাশ্যে আনে--- ওই সময় কিছু অস্ত্র সহ শত্রুসেনাদের গোপন তথ্য দিল্লীতে পাঠিয়েছিল ইজরায়েল। পারস্পরিক বিরোধী আওয়াজ সত্ত্বেও ইজরায়েল সবসময় ভারতকে সাহায্য দিয়েছে। কিন্তু বিপদের সময় ফিলিস্তিন কি কখনো ভারতকে সহায়তা করেছে? আরব ও মধ্য-পূর্ব দেশে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তা 'বৈশ্বিক নিজামত' প্রতিষ্ঠিত করার 'মজহবি জুনুনে'র প্রেরণাতেই। তেতো হলেও সত্য যে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক ইত্যাদি ইসলামী দেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের শরীয়তি শাসন ও নিয়মানুসার জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়। মিশরের গণআন্দোলনের পিছনে মুসলমান ভ্রাতৃত্বের (মুসলিম ব্রাদারহুড) মদত আছে। এর মূল ভাবনায় 'মজহবি' সঙ্কীর্ণতা ও কট্টর মৌলবাদ গভীরভাবে সন্নিবিষ্ট।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিজেপি-র রাষ্ট্রীয় সহসভাপতি)

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ইফতার : রাষ্ট্রের কাজ সর্বধর্ম রক্ষা করা, রাষ্ট্রীয় অর্থে কোনো ধর্ম পালন করা নয়

এন. সি. দে

ভারতবর্ষের দীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে দেশের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির শুধুমাত্র কদর্থই দেখে এসেছে। ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ কোনো ধর্মের পক্ষ নেওয়া নয়, কোনো ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করাও নয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে চলেছে ঢালাও মুসলমান তোষণ। অধিক মুসলমান তোষণে হিন্দুরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠায় এখন আবার কংগ্রেসী ও বামেরা মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে 'সংখ্যালঘু' শব্দটি আমদানি করেছে। কথায় কথায় মুখে শোনা যায় সংখ্যালঘু উন্নয়নের বাণী— সংখ্যালঘুদের জন্য মাদ্রাসা তৈরি, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি, সংখ্যালঘুদের জন্য চাকুরিতে সংরক্ষণ, প্রমোশন ইত্যাদি, ব্যবসার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণে সুবিধা, শিক্ষায় স্কলারশিপ, স্কুলে যাওয়ার জন্য সাইকেল ইত্যাদির ব্যবস্থা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তো বলেই দিয়েছিলেন হিন্দুস্থানের সম্পত্তিতে প্রথম ও প্রধান দাবি মুসলমানদেরই। তিনি সৈন্যবাহিনীতেও মুসলমান মাথা গোনা শুরু করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে সৈন্যবাহিনীতে তিনি এই মুসলমান কোটা চালু করতে পারেননি।

এইভাবে কংগ্রেসী ও বামেরা আমাদের দেশকে হিন্দু, মুসলমান ও সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুতে ভাগ করছেন। কিন্তু মুখে আউড়াচ্ছেন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী একবার সংসদে বিতর্কে বলেছিলেন যে হিন্দুস্থানে ধর্মনিরপেক্ষ বলে কোনো শব্দ হয় না। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা। কিন্তু মানুষ ধর্মহীন হতে পারে না। এদেশে ধর্ম একটি গুণবাচক শব্দ। জীব-জন্তু, জল-বায়ু সব কিছুরই নিজ নিজ ধর্ম অর্থাৎ গুণ আছে। অ্যানি বেসান্তও বলেছিলেন হিন্দুস্থানে ধর্ম বলতে ইংরেজি religion বোঝায় না। স্বামীজীও বলেছিলেন, '' 'হিন্দু' শব্দটির দ্বারা শুধু প্রকৃত হিন্দুদের বোঝায় না, মুসলমান, খৃস্টান, জৈন ও অন্যান্য যেসব লোক ভারতে বাস করে, তাদের সবাইকে বোঝায়।" অতএব 'হিন্দু' শব্দটি কোনো সাম্প্রদায়িক বিভাজনের শব্দ নয়। হিন্দু ধর্মীয় গুরুগণ কখনই ধর্মকে একটি মতবাদ হিসেবে মেনে নেননি, কোনো বিধি বা অনুশাসন হিসেবেও নয়।

কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্মই কোনো-না-কোনো ব্যক্তি প্রবর্তিত মতবাদ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীও লক্ষ্য করেছিলেন যে, ''কেবল আমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্মই কোনো বিশেষ ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মপ্রবর্তকদের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। খৃস্টধর্ম খৃস্টের, মুসলমান ধর্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম জিনগণের এবং অন্যান্য ধর্ম অন্যান্য ব্যক্তিগণের জীবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" এই কারণেই ওই মহাপুরুষদের জীবনের ঐতিহাসিক প্রমাণ নিয়ে যে বিবাদ হয়ে থাকে তা তাঁর মতে স্বাভাবিক। এখনও তাই পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও ধর্মে, বিশ্বাস ও যুক্তিতে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মবোধে, ধর্মে ধর্মে, নানা ধর্মমতের মধ্যে ও ধর্মের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যে সব সময়েই বিবাদ ও বিসংবাদ লেগে আছে।

রঙ্গনাথানন্দজী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন তার 'Vedic Vision of Universality and Harmony' গ্রন্থে— ''আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই যেহেতু আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত, আমাদের শিক্ষিত মানুষেরা এই সমস্যাগুলিকে তাই পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে বিচার করেন, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়।" তবে তিনি আশাবাদী যে ''এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে যখন আমাদের দেশের মানুষজন বৈদিক দর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে।" কিন্তু কীভাবে? অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাজধর্মের বড় বড় কথা বলেও

ইফতার পার্টিতে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বসে যে ইফতার পার্টি দিতেন, তা কি এই বৈদান্তিক সমদর্শনের উদ্বোধন? নাকি ভোটের জেতার জন্য তোষণ? তাই তো স্বামীজী এই বলে দুঃখ করেন যে, ''আধুনিক ভারতে ধর্মের আত্মা চলে গেছে, যা আছে শুধু বাহ্য ব্যাপার। এখনকার মানুষ হিন্দুও নয় বৈদান্তিকও নয়।"

ভারতীয় শাসকের শাসনের ভিত্তি হবে বেদান্ত দর্শন অর্থাৎ সকলের প্রতি সমদর্শন, সকলের জন্য সমভাব। 'ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত'— রাষ্ট্র ধর্মপালন করবে না, ধর্মাচরণ করবে, ধর্ম রক্ষা করবে। বৌদ্ধ ভারতে গুপ্ত যুগের শাসকগণ নিজেরাই বৌদ্ধ মতবাদের পালক হয়ে উঠেছিলেন। অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, ধর্মের বুলি আউরে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে গিয়েছিলেন, তার পরিণামে গোটা বৌদ্ধভূমিই হয়ে উঠেছিল ইসলাম ভূমি। রাষ্ট্রের কাজ শাসন, তোষণ নয়। নরেন্দ্র মোদীই সাহসিকতার সঙ্গে সেইপথ দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের ধর্ম-পালনে বাধার সৃষ্টি করেননি। সুষ্ঠুভাবে ঈদ পালনের জন্য সকলকে তিনি শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। কিন্তু ঈদ পালনের জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দেননি। রাষ্ট্রের কাজও বন্ধ রাখেননি। আমরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাই রঙ্গনাথানন্দজীর আত্মার শান্তি কামনা করি এই বলে যে আমাদের দেশের মানুষ বৈদিক দর্শনে উদ্বুদ্ধ হবেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে।

রাজনৈতিক ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যর্থতার সঙ্কটে বঙ্গ সিপিএম

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়॥ পশ্চিমবঙ্গে নানা টোটকা কাজে লাগিয়েও সিপিএম নেতৃত্ব দলের ব্যাকফুটে থাকা সংগঠনকে চাঙ্গা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর ফলে ব্যাকফুটে থাকা সিপিএম সংগঠনের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ২০১৪ সালে কলকাতা পুর নিগম-সহ রাজ্যের আশিটি পুরসভার নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে বলে মনে করছেন দলের একাধিক নেতা।

২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফলের আশা করলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর ফলে সংগঠনে চরম হতাশা নেমে আসার পাশাপাশি দলের তৃণমূলস্তরে দলত্যাগের হিড়িক ও বিজেপিমুখি প্রবণতা তীব্র হয়ে উঠেছে। সিপিএমের তৃণমূল স্তরের এই ভয়াবহ চেহারায় দলের রাজ্য নেতৃত্বও বেজায় বিপাকে পড়ে গেছেন।

এবার লোকসভার নির্বাচনের পর পশ্চিবঙ্গ রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে দলের রাজ্য সম্পাদকের পদ থেকে বিমান বসুর অপসারণ ও সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ভেঙে দেওয়ার দাবি উঠেছে একাধিক জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। যদিও রাজ্য নেতৃত্ব এই দাবিকে ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখিয়ে চলেছেন। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামেদের এমন রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব, মহম্মদ সেলিমরা দলের বিভিন্ন জেলা নেতৃত্ব ও জোনাল নেতৃত্বের দিকে আঙুল তোলার প্রয়াস নেন। এর ফলেই দলের বিভিন্ন জেলা ও জোনাল নেতৃত্বের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব জোরদার হয়ে উঠেছে।

সিপিএম থেকে আবদুল রেজ্জাক মোল্লা, লক্ষ্মণ শেঠের মতো একদা 'জ্যোতি বসুপন্থী' নেতাদের বহিষ্কারের পর পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় এর প্রভাব পড়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের সুতাহাটা, হলদিয়া, মহিষাদল, পাঁশকুড়ায় সিপিএম কার্যত সাইনবোর্ড সর্বস্ব দলে পরিণত হতে চলেছে। একইভাবে আবদুল রেজ্জাক মোল্লাকে বহিষ্কারের ঘটনায় দক্ষিণ চব্বিশপরগণার ভাঙড়, ক্যানিং প্রভৃতি এলাকায় সিপিএমের

সংগঠন ভেঙে পড়েছে। রেজ্জাক মোল্লা ও তাঁর সমর্থকরা এখন সরাসরি সিপিএমের রাজনৈতিক বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন। সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাঙড়, ক্যানিং ও পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক হলদিয়া বেল্টে রেজ্জাক মোল্লা লক্ষ্মণ শেঠের বহিষ্কারের যে কিছুটা সাংগঠনিক প্রভাব পড়েছে তা মানছেন। রাজনৈতিক মহলের জোর জল্পনা যে, লক্ষ্মণ শেঠ, রেজ্জাক মোল্লার মতো বিদ্রোহীরা শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সিপিএম সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই দলের বেঙ্গল লাইনপন্থীদের তীব্র বিরোধ চলে আসছে। ২০০৯ ও ২০১১ সালে লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম তথা বামেদের বিপর্যয়ের জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর অনুগামীরা প্রকাশ কারাতের 'হঠকারি লাইন'কেই দায়ী করেছিলেন। ভারত মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তির ইস্যুতে প্রথম ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার ও বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার ফেলার চেষ্টা, সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের ঘটনাকে দায়ী করেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু, গৌতম দেবদের মতো বেঙ্গল লাইনপন্থী সিপিএম নেতারা। যদিও কারাত শিবির এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। উল্টে ২০০৯ ও ২০১১ সালের বিপর্যয়ের পর ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম বিপর্যয় ও এবার লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম তথা বামপন্থীদের মহা বিপর্যয়ের পর এবার বুদ্ধদেব, বিমান বসু, গৌতম দেব সূর্যকান্ত মিশ্ররাই দলের বিভিন্ন জেলা ও জোনাল নেতাদের চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছেন। দল থেকে বহিষ্কৃত বিভিন্ন স্তরের নেতারা এবারের মহাবিপর্যয়ের জন্য সরাসরি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসুদেরই টার্গেট করছেন। একই সুর সিপিএমের জেলা ও জোনাল নেতাদের বড় অংশের।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ও বামেদের পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে শোচনীয় ফলের পর ২ জুন কলকাতার মুজাফ্‌ফর আহমেদ ভবনে সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ওই বৈঠকেই রাজ্য সম্পাদকের পদ থেকে বিমান বসুর পদত্যাগ ও সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ভেঙে দেওয়ার দাবি উঠলেও তা পাত্তা পায়নি। সিপিএম তথা বামেদের বিপর্যয়ের জন্য নীচের তলার ওপর দায় চাপানোর চেষ্টায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া-সহ একাধিক জেলা নেতারা।

এদিকে লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বাম তথা সিপিএমের বিপর্যয়ে উদ্বিগ্ন দলের ত্রিপুরা রাজ্য নেতৃত্বও। ভবিষ্যতে বাংলার বিপর্যয়ের প্রভাব ত্রিপুরায় পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও রয়েছে মানিক সরকার, বিজন ধর-সহ দলীয় নেতাদের মধ্যে। ত্রিপুরায় একইভাবে দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতা দখল রাখা ও দলীয় সংগঠন কব্জায় রাখা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ে ত্রিপুরা সিপিএম নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গায় মদত রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একটা পরিসংখ্যান দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। লোকসভার নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যে এই মুহূর্তে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা'র সংখ্যা ছ'শো ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে আবার বেছে বেছে ষাট শতাংশ দাঙ্গাই ঘটেছে বিধানসভা উপনির্বাচনের ক্ষেত্রগুলিতে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে একের পর এক কেন্দ্রে উত্তরপ্রদেশের শাসক দল মুলায়মের সমাজবাদী পার্টি ছাড়াও কংগ্রেস ও মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি যেভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে তাতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হতে চলা বিধানসভা উপনির্বাচনে ন্যূনতম অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও রাজ্য- রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেতে শিখ-মুসলমান দাঙ্গায় মদত দিচ্ছে ওই রাজনৈতিক দলগুলি। প্রসঙ্গত, বিধানসভার বারোজন সদস্য এবার লোকসভা ভোটে জেতায় ওই বিধানসভা আসনগুলো বিধায়ক-শূন্য হয়েছে এবং ওই বারোটি বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী কিছুদিনের মধ্যে উপনির্বাচন হতে চলেছে। দাঙ্গার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে। সেখানে ২৫৯টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। ওই অঞ্চলের পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। কেন্দ্রগুলি হলো--- সাহারানপুর নগর, বিজনূর, কৈরানা, ঠাকুরওয়াদা, গৌতমবুদ্ধ নগর। এছাড়া তেরাই, অবধ, বুন্দেলখণ্ড ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশে যথাক্রমে ২৯,৫৩, ৬ ও ১৬টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। (দ্রষ্টব্য : সারণি-১)। তেরাই-য়ে দু'টি আসনে (নিংহাসন ও বলহা), অবধে একটি আসনে (লক্ষ্ণৌ পূর্ব কেন্দ্র), বুন্দেলখণ্ডে দু'টি আসনে (চরকহরি, হামিরপুর) এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশেও দু'টি আসনে (সিরাথু, রোহানিয়া) এবার উপনির্বাচন হচ্ছে।

আজম খান ও অন্যান্য মুসলিম নেতাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব।

রাজ্যের প্রায় আটাশটি জেলাতে এই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বড়ো ধরনের সংঘর্ষের নিরিখে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে মুজফ্‌ফরনগরে। (দ্রষ্টব্য : সারণি-২)। গত ঈদের আগে রমজানের সময় গোটা রাজ্যেই অশান্তি ছড়িয়েছে। এতদিন রাজ্য-প্রশাসনের মদতে যত্রতত্র মাইক বেঁধে, বিশেষ করে হিন্দু মন্দিরের কাছে নামাজ পড়া হোত। এর বিরুদ্ধেই গত লোকসভা নির্বাচনের আগে এককাট্টা হয় হিন্দুরা। যার স্পষ্ট প্রতিফলন এবার গোটা উত্তরপ্রদেশ জুড়েই দেখা গিয়েছে। হিন্দু-মন্দিরে শিবকথা কিংবা হনুমান চল্লিশা পাঠের সময় মাইকে অকারণ আজান বাজায় প্রতিবাদে মুখর হয়েছে তারা। ফলে কখনো কখনো মুসলমানদের ব্যাপক হামলার মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। যার পেছনে রাজ্য-প্রশাসনের মদত ও শাসক দলের নির্দেশে কাজ করেছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন। কিন্তু এবার হিন্দুদের প্রতিবাদী-সত্তা অনেক বেশি থাকায় বিশেষ সুবিধে করা যায়নি। বিজনূরের কেরাতপুর এলাকায় বিজনূর-হরিদ্বার সড়কে যে ফটকটি নির্মিত হচ্ছিল তার চূড়াটি অকারণে ইসলামিক মিনারের আকারে রূপ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। গত জুলাইয়ের মাঝামাঝি এর প্রতিবাদে হিন্দুদের এক প্রতিনিধিদল জেলা-প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করে এই কাজ বন্ধের দাবি জানান। এই দাবি যুক্তিসঙ্গত মনে করে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয় প্রশাসন। কিন্তু তা নিয়েও ষড়যন্ত্র করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উস্কে দেবার চেষ্টা করছে স্থানীয় শাসকদলের নেতারা। এমনটাই অভিযোগ।

ছোটোখাটো ঘটনা, এমনকী পারিবারিক অনুষ্ঠান-পার্বনাদিকে কেন্দ্র করে উস্কানিমুলক আচরণের মাধ্যমে দাঙ্গা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। যেমন কিছুদিন আগেই শেরকোট থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরবর্তী নূরপুর জেলার চিপেরী গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান মহাবীর সিংয়ের ভাইপোর জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলছিল। রাতে অনুষ্ঠানে শেষ হয়ে গেলেও পরেরদিন কয়েকটি সংবাদপত্রে দেখা যায় তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় মুসলমান দুষ্কৃতীরা। এধরনের প্ররোচনামূলক ঘটনা সমাজবাদী পার্টি কিংবা কংগ্রেসের মদতে মুসলমানরা যে ইতিপূর্বে ঘটনায়নি তা নয় কিন্তু এবার হিন্দুরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। যার ফলে প্রশাসনও স্থানীয় মানুষের প্রবল চাপের মুখে পড়ে কখনো-সখনো ব্যবস্থা নিচ্ছে। যেমন উপরোক্ত ঘটনাটির পরেরদিনই ওই জেরেই এক মন্দিরে ভাঙচুর চালানোর অপরাধে এক মুসলমানকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় স্থানীয়

পুলিশ।

তবে উত্তরপ্রদেশের শাসক দল মুলায়ম-অখিলেশের সমাজবাদী পার্টির প্রশাসনের গাফিলতি ও মুসলমান আনুকূল্যের জন্যও রাজ্য জুড়ে বিশেষ করে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছে দাঙ্গা। যেমন সাহারানপুরে বাইশ বছরের এক হিন্দু কিশোরীকে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তক্ত করছিল মুসলমান দুষ্কৃতীরা। পরে তাকে গণধর্ষণও করা হয়। বারবার পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। শেষে মেয়েটি গায়ে আগুন দেয়। ঘটনার প্রতিবাদে গত ১৫ জুলাই ক্ষিপ্ত জনতা প্রায় ডজনখানেক গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। আরও একটা ঘটনা ঘটে মোরাদাবাদের কাছে গত ৫ জুলাই। মন্দিরের লাউডস্পীকার খুলে নেবার প্রতিবাদে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা জমায়েত করলে পুলিশ তাদের অনুমতি না দিয়ে বরং পাল্টা আক্রমণ করলে দু'পক্ষের সংঘর্ষ বাঁধে বলে অভিযোগ।

মুজফ্‌ফরনগরে এই দাঙ্গা অবশ্য গত এক বছর ধরেই চলে আসছে। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল গত বছরের ২৭ আগস্ট। মালিকাপুর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে কাবাওয়াল গ্রামের জনৈক মুসলমান যুবক শাহনাওয়াজ এক জাঠ কিশোরীকে ক্রমাগত যৌন নিগ্রহের চেষ্টা করে। পুলিশ-প্রশাসন তখন চোখে ঠুলি পরে বসেছিল। বাধ্য হয়ে কিশোরীর দুই দাদা শচীন ও গৌরব নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে শাহনাওয়াজকে খুন করে বলে অভিযোগ। এর পরে পাল্টা শচীন আর গৌরবকেই খুন করে একদল মুসলমান দুষ্কৃতী। ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী শামলি জেলায়। এভাবে শিখ-মুসলমান সংঘর্ষ ছড়ায় গোটা রাজ্যেই, সাম্প্রতিকতম লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যপ্রশাসনের মদতে যা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশেষ করে দলিত এলাকায় মুসলমানদের দলিতদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে অখিলেশ সরকার আর মুলায়মের দল। ফলে দলিত-মুসলিম সংঘর্ষও এবার অনিবার্য হয়ে পড়েছে বলে অভিমত তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। পক্ষপাতদুষ্ট রাজ্যসরকারের আমূল পরিবর্তনই যে এর থেকে রাজ্যের একমাত্র পরিত্রাণের পথ সে ব্যাপারে সব মহলই একমত।

সারণি-১

উত্তরপ্রদেশে বড়ো সংঘর্ষ ক্ষেত্রওয়াড়ি খতিয়ান

পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ

দাঙ্গা-২৫৯

মুজফ্‌ফরনগর	৪৭
শামলি	৩০
মীরাট	৩০
মোরাদাবাদ	৩০
সাম্ভল	৩০
আমরোহা	২৯
বুলান্দশহর	১৫
সাহারানপুর	১৫
গাজিয়াবাদ ও নয়ডা	১৩
বাঘপত	১০
রামপুর	১০

তেরাই

দাঙ্গা-২৯

বাহারাইচ	১০
বালরামপুর	০৮
ঘেরি	০৭
শ্রাবস্তী	০৪

অবধ

দাঙ্গা-৫৩

লক্ষ্ণৌ	১০
উন্নাও	২২
কানপুর	১৬
বারাবানকি	০৫

বুন্দেলখণ্ড

দাঙ্গা-৬

হামিরপুর	০৩
মাহোবা	০৩

পূর্ব উত্তরপ্রদেশ

দাঙ্গা-১৬

বারাণসী	০৫
প্রতাপগড়	০৫
ফতেপুর	০২
কাউসম্ভি	০২
মীরজাপুর	০২

সারণি-২

সরকারি খতিয়ানে দাঙ্গার জেলাওয়াড়ি হিসাব

১০টি দাঙ্গা

মুজফ্‌ফরনগর

৯টি দাঙ্গা

বিজনূর, মীরাট, মোরাদাবাদ

৮টি দাঙ্গা

আমরোহা, সাহারানপুর

৭টি দাঙ্গা

সম্বল, বেরেলি

৬টি দাঙ্গা

সামলী

৫টি দাঙ্গা

বাঘপত, রামপুর
বাহারাইচ, বলরামপুর

৩টি দাঙ্গা

উন্নাও, বাদায়ুন, খেরি
আলিগড়

২টি দাঙ্গা

গাজিয়াবাদ, ইটাহ,
ফৈজাবাদ, কানপুর

১টি দাঙ্গা

পিলভিট, গৌতমবুদ্ধ নগর, বারাবানকি, হাতরাস, ফতেহপুর, শাহজাহানপুর, দেওরিয়া

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

স্বপ্ন পূরণে ‘তাপস’

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আই আই টি থেকে খুব ভালোভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় প্রতিটি মেধাবীছাত্র। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকা, পড়াশুনোর ব্যাপারে ভালো পরামর্শ ও ভালো কোচিং-এর সুবিধা না থাকায় অনেক মেধাবীছাত্র নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না। এরকমই গরিব ছাত্রদের নিঃশুল্ক শিক্ষা ও কোচিং-এর সুযোগ দিয়ে তাদের স্বপ্ন সাকার করতে ব্যাঙ্গালোরের রাষ্ট্রোত্থান পরিষদ যোজনাবদ্ধভাবে কাজ শুরু করেছে। রাষ্ট্রোত্থান পরিষদের সংস্থা ‘তাপস’ গরিব ছাত্রদের নিঃশুল্ক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আই আই টি-র প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার উপযুক্ত করে তৈরি করছে। তাপস থেকে কোচিং নেওয়া ছাত্ররা আই আই টি এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থায় খুবই ভালোভাবে ভর্তি হতে পারছে।

রাষ্ট্রোত্থান পরিষদ মেধাবী ছাত্রদের নামকরা সংস্থায় ভর্তির সুযোগ করে দেবার জন্য ২০১২ সালে ব্যাঙ্গালোরে ‘তাপস’ প্রতিষ্ঠা করে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের তাপসে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এখানে প্রবেশের জন্য তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। প্রথমে অ্যাডমিশন টেস্টের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করার পর পাঁচদিনের ওয়ার্কশপ এবং শেষে ছাত্রদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তিন পর্যায়েই ভালো ফল করতে পারলে ছাত্রদের তাপসে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়।

একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর আই আইটি-র জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের এখানে নিঃশুল্ক কোচিং দেওয়া হয়। সমস্ত ছাত্রকেই তাপসের নিজস্ব ছাত্রাবাসে থাকতে হয়। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে থাকা-খাওয়াও নিঃশুল্ক। বি এ এস ই পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পড়ানো হয়। তাপসের প্রিন্সিপাল পুষ্প রুদ্রেশ বলেন— “এবার ২০১৪-তেই তাপসের প্রথম ব্যাচ পাসআউট করেছে। ৪০ জন ছাত্রদের মধ্যে ৭ জন আই আই টি-র জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাশ করেছে। বাকি ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আই আই টি-র সাত ছাত্র ছাড়া বাকিরা হাজারের কমেই র‍্যাঙ্ক করেছে। ইতিমধ্যে ছাত্ররা নিজের নিজের পছন্দমতো সংস্থায় ভর্তিও হয়েছে।

বর্তমানে তাপসে একাদশ, দ্বাদশে ও জয়েন্টে বসবে এমন ছাত্রদের সংখ্যা ৬৮ জন। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ২৫৫ র‍্যাঙ্ক করা প্রশান্তর বাবা একজন গ্রাম্য শ্রমিক, ১০০৭ র‍্যাঙ্কের রঘুবেন্দ্র বাল্মীকির বাবা একজন সাফাই কর্মী। এরকম দুই ছাত্রের বক্তব্য— যদি তাপস না থাকতো তবে পড়াশুনায় ভালো হওয়া সত্ত্বেও তাদের আর পড়া হোত না। ব্যাঙ্গালোরের গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রদের কাছে তাপস আজ স্বপ্নপূরণের স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ■

অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পাঠরত ছাত্ররা।

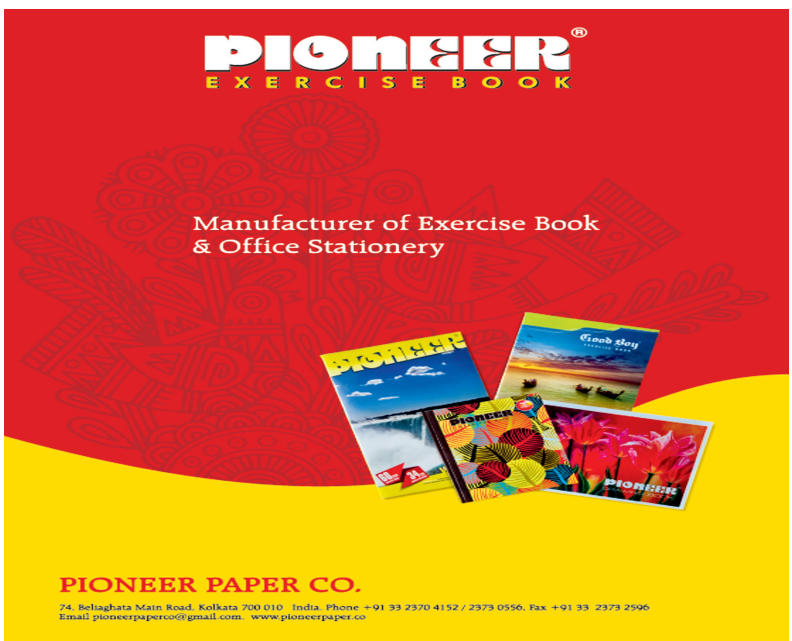

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"হিন্দুধর্ম বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। বাস্তব জীবনের উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন নিজ শাস্ত্র থেকে তা প্রকাশ করে এই ধর্ম পুনরায় আপাতবিরোধী আদর্শগুলির এক সমন্বয় সাধন করেছে। এতে সমাজবন্ধনমুক্ত জীবনের সঙ্গেও সমাজের একটা যথার্থ সম্পর্ক রয়েছে দেখা যায়। হিন্দুধর্ম জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে এভাবে শিক্ষা দিয়েছে, যাতে কেবল অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীই নয়, শহরের কর্মব্যস্ত কশাই থেকে গৃহের পতিব্রতা স্ত্রী পর্যন্ত সকলেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। — ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

'নয়নে আঁধার রবে ধেয়ানে আলোকরেখা'

নবকুমার ভট্টাচার্য

জীব মায়া আবৃত বলেই আত্মস্বরূপ ভুলে থাকে। তাই সেই বিস্মৃতির সময়ে মায়া আপন প্রকৃতিজাত গুণ দ্বারা জীবকে সংসার মোহে আবদ্ধ করে রেখে, নিত্য নতুন দুঃখের দণ্ডে দণ্ডিত করে। তখন কেবল শাস্ত্র ও মহাপুরুষের সদুপদেশে জীবের আবদ্ধমন আবার মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতি পায়। করুণাময় জগদীশ্বর জীবের নিষ্কৃতির জন্য বেদ পুরাণ শাস্ত্রের সৃষ্টি করেছেন। গীতার উপদেশাবলী এজন্যই। শাস্ত্র আচার্য রূপে এবং জীবের অন্তরঙ্গরূপে অন্তর্যামী পর্যায়ে তিনি অন্তরে অবস্থান করে থাকেন। তিনিই যে জীবের একমাত্র আশ্রয় স্থল, তিনিই যে জীবের একান্ত আপনজন— গীতায় সে কথাই বারবার বলা হয়েছে। মানুষ এই সংসার জীবনযাপন করেও যে মায়ামুক্ত হতে পারে, আসক্তির দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে--- সেই কথা বলা হয়েছে। সেই আশ্বাসই ভগবান গীতায় দিয়ে গেছেন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। সংসার ত্যাগ করতে হবে না, সংসার ঈশ্বর ছাড়া নয়। কিন্তু মনে ত্যাগ চাই। ভগবান বলেছেন— সব কাজকর্ম কর কিন্তু তোমরা মনে ত্যাগ কর। অর্থাৎ মনকে বোঝাতে হবে সবই ঈশ্বরের কাজ। আমিও তাঁরই। এই জীবন সংসার যে-কোনো মুহূর্তে শূন্যতায় বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং সেটাই অবধারিত ভবিতব্য। সুতরাং সেকথাও স্মরণে রেখে চলতে হবে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবারই বলেছেন যে, ঈশ্বর এক বই দুই নয়, 'একং সদ্ শক্তি যোগেন বহুধা'; অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় একই ভক্তের প্রার্থিত রূপে নানাভাবে দর্শন দেন। তিনি সাকার, আবার নিরাকারও বটে। রূপ ও অরূপের মিলন ভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই পরব্রহ্ম পরমপুরুষ— যিনি একাধারে ব্যক্ত, অব্যক্ত, ক্ষর ও অক্ষর এবং রূপসাগরের অরূপরতন। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বাসুদেব আবার তিনিই নিরূপম রূপের আধারে ব্রজকিশোর, বনমালী, গোপতনু, মেঘবরণ শ্যামরায়। মানুষের জীবনের উত্তরণ ঘটে নিঃস্বার্থ কর্তব্যে। সেই কর্তব্যকেই স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা

করা হয়েছে গীতাতে।

কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে না উঠলে— এই মায়াবিভ্রান্তির বশ্যতা থেকে জীব কোনোদিনও শ্রেয়লাভের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ কাম থেকেই কামনার জন্ম এবং এই কামনার কোনো শেষ নেই। ভগবান তাই বলছেন--- 'আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা'... অর্থাৎ কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— সংসারী লোকগুলি তিন জনের দাস। মাগের দাস, মনিবের দাস ও টাকার দাস। কিন্তু কী ভোগ সংসারে করবে? কামিনীকাঞ্চন ভোগ? সে তো ক্ষণিক আনন্দ। এই আছে এই নেই। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই কি লিখেছেন— 'যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি তারা তো চাহে না আমারে। তারা আসে, আর চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু মাঝারে।'

পুস্তক প্রসঙ্গ

মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যে ব্যাকুল হয় ভগবান তাকে আপনি উপায় বলে দেন। তাই অবিদ্যামায়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভগবানের কাছে একান্ত ভাবে প্রার্থনা জানাতে হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত সংসারে থাকুন অথবা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীই হন তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঈশ্বর সংযোগ সংশুদ্ধি আগে দরকার, সেখানেই সব সংশয়, সব দ্বন্দ্বের নিরসন, তখনই 'অন্তর সন্ন্যাস' ঘটে। তখনই আত্মজয়ী হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবাত্মার মঙ্গলের জন্য সে কথাই বলেছেন। শ্রীকালীপদ সামন্ত গীতার সেই কথাগুলিই সহজ সরল ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এরাজ্য থেকে সংস্কৃতকে নির্বাসনের ফলে সাধারণের কাছে গীতার ব্যাখ্যা করার মতো ভাষ্যকার ক্রমশ কমে আসছে। এই গ্রন্থটি সেই অভাব পূরণ করবে। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর গীতার পদ্যানুবাদ করার কথা ভেবেছিলেন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের অনুসন্ধান পত্রিকায় প্রাথমিক কয়েকটি শ্লোকের পদ্যানুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেকাজ তিনি করে যেতে পারেননি। কালীপদ সামন্তের পদ্যানুবাদ কি সে অভাব পূরণ করবে? পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরের পদ্যানুবাদ দিয়েই শেষ করি— (গীতা সুগীতা কর্তব্যা...) 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হতে, যে গীতা আসিয়া স্থিতি লইল জগতে। বারবার তন্ন তন্ন করিয়া বিচার, গ্রহণ কর শেষে সবটুকু তার।। গীতার সম্যকজ্ঞান হইবে যখন, অন্য শত শত শাস্ত্রে কিবা প্রয়োজন?

আমি শ্রীকৃষ্ণ বলছি। লেখক : কালীপদ সামন্ত। নারায়ণ বুক ডিপো। ১৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩। দাম : ১৮০ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ কি শাক্ত উপাসক ছিলেন?

নবকুমার ভট্টাচার্য

অনেকের মতে বিষ্ণুর রূপধারী কৃষ্ণ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কৃষ্ণনাম বৈষ্ণব ধর্মের মূল মন্ত্র। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রয়েছে— স্বয়ং শ্রীরাধা ছিলেন লক্ষ্মীর অবতার। বৈষ্ণবেরা কেউ কেউ শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণরূপে, কেউ কেউ আবার চতুর্ভুজ শান্ত মনোহর লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুরূপে ধ্যান করেন। কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ ছিলেন শক্তির উপাসক। 'রাধাতন্ত্র' নামক গ্রন্থে শক্তির উপাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনযাত্রা শাক্ত উপাসনার জীবন্ত চিত্র। রাধার সঙ্গে মিলনেই কৃষ্ণের জীবনে নাকি সিদ্ধিলাভ হয়। রাধাতন্ত্র বঙ্গপ্রদেশের প্রচলিত গ্রন্থ। এ পর্যন্ত যে কয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তার সবগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং বঙ্গদেশেই প্রাপ্তব্য। রাধাতন্ত্র ১৭৭৭ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী বলেই মনে হয়। ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বিরচিত শ্যামাসপর্যাবিধি গ্রন্থে গ্রন্থসমূহের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রাধাতন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। বৃহদ্‌রাধাতন্ত্র নামেও একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

মহাদেব একবার শরণাগত বাসুদেবকে ত্রিপুরাসুন্দরীকে পুজো করবার উপদেশ দিলে বাসুদেব তাঁর আরাধনা করতে লাগলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল সাধনা করেও তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না। অবশেষে দেবী তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন— ''কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। তুমি লক্ষ্মীকে ত্যাগ করে বৃথাই তপস্যা করছ। তবে তোমার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, তুমি এই সর্বসিদ্ধিদায়িনী কলাবতী মালা ধারণ কর। তুমি মথুরায় ফিরে যাও, সেখানে আমার দূতী পদ্মিনী রাধারূপে জন্ম নেবে। পদ্মিনীও তখন আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে মহাবাহো, তুমি সত্বর ব্রজে গমন কর। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।'' তোমার আগেই বৃষভানুর গৃহে আমার জন্ম হবে। চৈত্র মাসের পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত নবমীতিথিতে রাধা আবির্ভাব হন। এরপর ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাকালীর উপাসক বৃষভানু কাত্যায়নীদেবীর কাছে কাত্যায়নীসদৃশ কন্যা কামনা করেছিলেন। সেই বরেই রাধার আবির্ভাব। শিশুকাল হতে রাধাও শক্তির উপাসনা আরম্ভ করলেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে কাত্যায়নী তাঁকে বর দিয়ে বললেন— ''হেমন্তকালে পূর্ণিমা তিথিতে বাসুদেবের সহিত তোমার মিলন হবে। তোমার সঙ্গ ব্যতীত তিনি কোনো কাজ করতে পারবেন না— আর তোমার সঙ্গলাভের ফলেই তাঁর কৈবল্যলাভ হবে।'' পরে রাধাকৃষ্ণের মিলিত আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী রাধাকে বলেছিলেন— 'কালীয়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণের যত কিছু কীর্তি সকলই কালিকার প্রসাদে। দৃশ্যাদৃশ্য যা কিছু সকলই মহামায়ার স্বরূপ। শক্তি ব্যতীত এজগতে কিছুরই অস্তিত্ব নেই।' মহাবিদ্যা উপাসনা করে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্তব্য।

রাধাতন্ত্রের তান্ত্রিক কাহিনী অনুসারে এক রাত্রে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখলেন— কালিকা আবির্ভূত হয়ে বলছেন, বৎস আমি তিন রাত্রি নৌকা রূপে যমুনা মধ্যে অবস্থান করব। তুমি নৌকায় রাধার সঙ্গে ক্রীড়া ও জপ করলে পরম সুখ লাভ করবে।

কৃষ্ণ নৌকায় নমস্কার করে আরোহণ করলেন। সমস্ত দিন রাত্রি ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। মন্ত্র জপ করে রাত্রিশেষে কালীরূপিণী বাঁশি বাজাতে লাগলেন। এই সময়ে গব্য বিক্রয়ের ছলে রাধা যমুনা তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদী পার করে দেবার জন্য রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করলে কৃষ্ণ স্ত্রীর ভাবে মিলিত হবার কামনা করলেন। এই নিয়ে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বহু তর্ক হলো। তারপর রাধা নিজের অলৌকিকত্ব প্রমাণের জন্য নিজ দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে কৃষ্ণকে স্পষ্টই বললেন— 'তোমাকে আমার মনুষ্য বলেই মনে হয়। মানুষের সঙ্গে আমার মিলন কখনই সম্ভব নয়। তুমি যদি তোমার দেবত্ব প্রমাণ করতে পারো। তবেই আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি।' কৃষ্ণ তখন কালীর পাদপদ্ম স্মরণ করে নিজরূপ ধারণ করে বললেন। 'আমিই সেই মহাবিষ্ণু, জগতের হিতার্থে আত্মগোপন করে দ্বিভুজ ধারণ করেছি মাত্র।' এরপর কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে যমুনানদীর নৌকোর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন হলো। রাত্রিশেষে রাধা স্বস্থানে গমন করলে কালী আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন— 'আজ তুমি সিদ্ধিলাভ করলে'।

পরবর্তী জীবনে কৃষ্ণ রুক্মিণী-সহ আটজনকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যহ দিন ও রাত্রিতে দ্বারকাপুরীর রত্নমন্দিরে দেবী শ্রীবিদ্যার আরাধনা করতেন। নিত্য অষ্টতণ্ডুল, দূর্বা প্রভৃতি উপকরণে দেবীর পুজো করে দশাক্ষর মন্ত্র জপ করতেন। এইরূপে শাক্ত পদ্ধতিতে উপাসনা করে কৃষ্ণ অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই তন্ত্রে বলা হয়েছে— ব্রজভূমিতে দেবী সর্বদা অধিষ্ঠিত। এখানকার তমাল বৃক্ষ স্বয়ং কালী এবং কদম্ব ত্রিপুরা— 'যত্র কালী মহামায়া মহাকালী সদাস্থিতা। তত্র বৃক্ষো মহেশানি স্বয়ংকালী তমালকম্। কদম্বং পরমেশানি ত্রিপুরা ব্রজমণ্ডলে।' আরও বলা হয়েছে— 'কৃষ্ণস্য শ্যামদেহস্তু স্বয়ংকালী মহেশ্বরি।' মুণ্ডমালাতন্ত্রেও বলা হয়েছে— কৃষ্ণসাক্ষাৎ কালী।

শাক্ততন্ত্র মতে সহস্রার পরমশিবের স্থান, আবার সহস্রারকে কৃষ্ণের স্থান বলে নির্দেশ করা হয়েছে। সহস্রদলপদ্ম বা সহস্রারই গোকুল। ভগবানের অনন্তরূপের অংশসম্ভূত এই পদ্মের কর্ণিকাই সেই ধাম। এই কর্ণিকা একটি ষট্‌কোণ মহদ্‌যন্ত্র। এই যন্ত্রের কেন্দ্রে আছে ক্লীঁ বীজরূপ হীরকসদৃশ কীলক। ষট্‌কোণে ষট্‌পদী অর্থাৎ ক্লীঁ 'কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা' এই ষড়ঙ্গ অষ্টদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র বিরাজমান। এই মন্ত্র প্রকৃতিপুরুষ রূপে অভিব্যক্ত। অর্থাৎ এই কর্ণিকার উপরে প্রকৃত পুরুষ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ নিত্যরসরাস বিহার করেন।

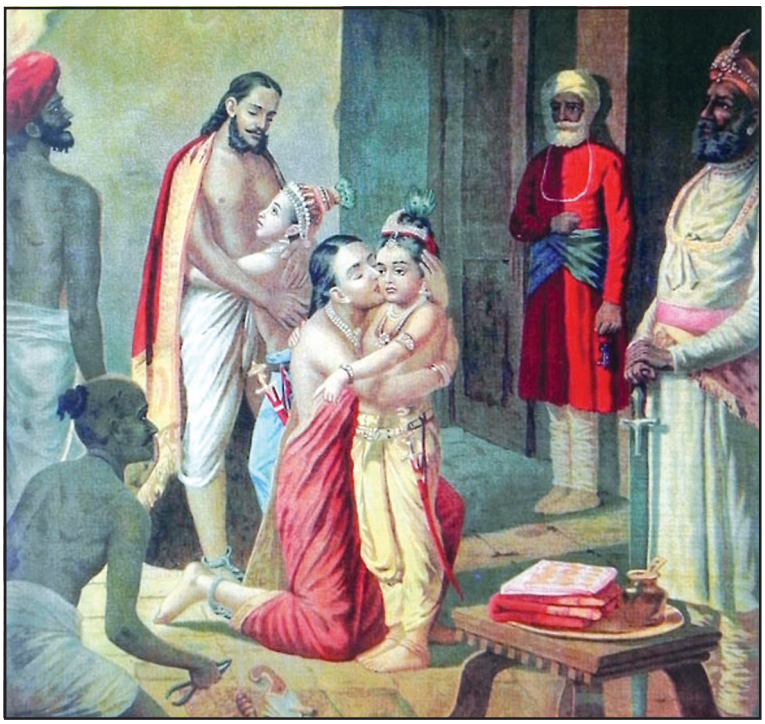

কৃষ্ণজননী—দেবকী

রূপশ্রী দত্ত

পুরাকালে ঋষি কশ্যপ, বরুণদেবের কামধনু গাভী অপহরণ করে তা প্রত্যর্পণে কিছুতেই সম্মত হননি। তাই, বরুণ অভিশাপ দিলেন, কশ্যপ ও তাঁর স্ত্রী অদিতি, জন্মান্তরে, সন্তানের কারণে দুঃখবরণ করতে বাধ্য হবেন। তাঁরাই পরবর্তীকালে বসুদেব ও দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অভিসম্পাতে বিচলিত অদিতিকে সে সময় বিষ্ণু আশ্বাস দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে, তিনি জন্মান্তরিত অদিতির সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

উগ্রসেন ও দেবক নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। উগ্রসেন ছিলেন মথুরার রাজা। তাঁর পুত্রের নাম কংস আর তাঁর ভ্রাতা দেবকের কন্যার নাম দেবকী। কংসের কোনো সহোদরা না থাকায়, তিনি দেবকীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যথাকালে যাদববংশীয় বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিবাহ হলো। কন্যা পতিগৃহে যাবার সময় একশত সুবর্ণ রথ, চারিশত হস্তী ও বিশাল সেনাবাহিনী তাদের সহযাত্রী হলো। কংস ভগ্নীর প্রতি স্নেহবশত, নিজেই রথের সারথি হলেন। হেনকালে এক দৈববাণী শোনা গেল— 'ও হে নির্বোধ, যে নারীকে তুমি স্নেহবশত রথচালনা করে নিয়ে চলেছ, তারই অষ্টমগর্ভের সন্তান তোমাকে হত্যা করবে।' কংস, দৈববাণী শুনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবকীর কেশাকর্ষণপূর্বক তাঁকে অস্ত্রদ্বারা হত্যা করতে উদ্যত হলেন। বসুদেব কংসকে শান্ত করার চেষ্টায় বিফল হয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাঁদের সন্তানের জন্মক্ষণেই তিনি কংসের হাতেই তুলে দেবেন। সত্যনিষ্ঠ বসুদেবের কথায় কংস শান্ত হয়ে দেবকীকে হত্যার চেষ্টা থেকে নিরস্ত হলেন।

দেবকীর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের পর বসুদেব তার নামকরণ অনুষ্ঠানে পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করলেন। তাঁরা নবজাতকের নামকরণ করলেন— কীর্তিমান। কিন্তু পিতামাতার এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হলো। বসুদেব তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো পুত্রকে নিয়ে কংসের কাছে গেলেন। কংস দয়াপরবশ হয়ে বললেন— 'অষ্টম সন্তানই আমার ভয়ের কারণ।

এই নিষ্পাপ শিশুকে নিয়ে যাও।' বসুদেব বুঝলেন, দুর্জন কংসের এটা কূটনৈতিক চাল। তিনি এ শিশুকেও আপাতত ছাড়লেও পরে রেহাই দেবেন না। অবশেষে সপ্তম সন্তান বলরাম, ভ্রূণাবস্থায় নিজেকে বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করলেন। পরবর্তী কন্যাসন্তান— যিনি যোগমায়ার অংশ— তিনি নিজেকে স্থানান্তরিত করলেন, যশোদার গর্ভে। তারপর দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ। মাতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ ও আসন্ন অনিবার্য বিপদের আশঙ্কা, দেবকী বসুদেবকে অনুরোধ করেন, শিশু কৃষ্ণকে নন্দ-যশোদার গৃহে রেখে আসার জন্য। বসুদেব তখন যশোদার গর্ভে জন্মানো কন্যাসন্তানকে নিয়ে আসেন। কংস ক্রমক্রমে ভাবে, এই সন্তানই তাঁর চিরশত্রু অষ্টম গর্ভের সন্তান। তিনি তাকে সজোরে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করলেন। যোগমায়া তখন নিজরূপ ধারণ করে অন্তর্হিত হওয়ার সময় বলে— 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মথুরায় দেবকীর দেখা হয়েছিল। কংসের ব্যাপারে, দেবকী, কৃষ্ণকে নিয়ে সদাশঙ্কিত ছিলেন। কিন্তু, বলরাম তাঁকে কৃষ্ণের ঐশী শক্তি ও অবতারত্ব সম্বন্ধে জানিয়ে শান্ত করেছিলেন।

দেবকীকে রবীন্দ্র-কথিত 'কাব্যে উপেক্ষিতা' বলে এযুগের মানুষের মনে হয়। সন্তানের নিরাপত্তার জন্য, তার প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে, তাঁকে চিরদিন অন্যত্র থেকে সন্তানবিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল। আমরা তাই পালক মাতা-পিতা নন্দ-যশোদার কথা যতটা পাই, নেপথ্যচারিণী দেবকীকে ততটা নয়।

রাখিবন্ধন উৎসব

গত ১০ আগস্ট সকাল সাড়ে ছটায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ির রথখোলা শাখার উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। রথখোলার আনন্দ নিকেতন আশ্রমস্থিত মন্দির পরিসরে অনুষ্ঠিত উৎসবে প্রধান বক্তা ছিলেন পরমার্থ সাধক সঙ্ঘের বাঁকুড়া শাখার অধ্যক্ষ স্বামী রামেশ্বর চৈতন্য পুরী মহারাজ। তিনি তাঁর ভাষণে বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করে ভারতবর্ষে বিভিন্ন মতপথের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার উপর জোর দেন। প্রাস্তাবিক ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কর্তৃক পালিত সারা বছর ব্যাপী ছয়টি উৎসবের মধ্যে অন্যতম রাখিবন্ধন উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কমলেশ সরকার। উৎসব পরিচালনা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ চন্দন সেনগুপ্ত ও সুধীর ঘোষ। শতাধিক স্বয়ংসেবক ও মা-বোনেরা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে সকলে সকলের হাতে রাখি বাঁধেন। শিলিগুড়ি গীতা প্রচার মণ্ডলীর সভাপতি প্রদীপ দত্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

রাখি পূর্ণিমায় সংস্কারভারতী'র 'মিলনসূত্র'

রাখি পূর্ণিমার পুণ্য প্রভাতে সিউড়ি স্টেট ওয়েল ফেয়ার হোম প্রাঙ্গণে ৮১ জন আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে সংস্কারভারতী সিউড়িশাখা রাখি উৎসবের আয়োজন করে। সমাজের পিছিয়ে পড়া অনাথ শিশু-কিশোররা অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে আসন অলঙ্কৃত করেন সরকারি হোমের সুপার কাকলী কুণ্ডু। অন্যান্য অতিথিরা হলেন কাজল চক্রবর্তী, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল রায়। অনুষ্ঠানের মাঝে বকুল বৃক্ষরোপণ করা হয় হোম প্রাঙ্গণে। পরের অধিবেশনটি বসেছিল অরবিন্দ ইনস্টিটিউশন ফর সাইটলেস্ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিহীন ছাত্রদের মাঝে। পরবর্তী অনুষ্ঠানস্থল সিউড়ি মুক ও বধির বিদ্যালয়। ৬২ জন ছাত্রছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কথায়-কবিতায়-গানে রাখি উৎসব পালিত হয়। যারা সমাজের উপেক্ষিত অনাথ, দৃষ্টিহীন ও মূকবধির ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে রাখি উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছে— 'মিলনসূত্র'।

পরিবার প্রবোধনে রাখিবন্ধন

গত ৯ আগস্ট শনিবার বিকাল ৫টায় উত্তর মালদহ জেলার চাঁচল শহরে এক ভব্য পরিবেশে মাতৃসম্মেলনে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী রূপে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল দাক্ষায়ণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মৌসুমী চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন স্থানীয় নার্সারি স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা খেয়ালী চক্রবর্তী। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কার্যকারিণীর সদস্য তথা পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত সংগঠক মুটুকেশ্বর পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে মায়েদের ভূমিকার বিষয়ে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে চাঁচল শহরের বিশিষ্ট পরিবার থেকে ৭৫ জন মা ও বোনেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের দিদিভাই চন্দনা চট্টোপাধ্যায় ও সুস্মিতা সরকার।

গৌড়ীয় নৃত্যশৈলীতে মেঘনাদ বধ কাব্য

বিকাশ ভট্টাচার্য

উত্তর ভারতের কত্থক, দক্ষিণের ভরতনাট্যম, কথাকলি, কুচিপুড়ি, মোহিনী আট্টম, ওড়িশার ওড়িশি নৃত্য আছে। বাংলার নিজস্ব নৃত্যকলা কি কিছুই নেই? এমনই জিজ্ঞাসা নিয়ে সারা বাংলার এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন বিজ্ঞানের এক অধ্যাপিকা। জুলজি পড়ানো যাঁর পেশা কিন্তু নৃত্য তাঁর প্যাশন। তিনি দেখেছেন বর্ধমান, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর এমনকী কলকাতার কাছে বাঁশবেড়িয়ার অসংখ্য মন্দিরগাত্রে নৃত্যরতা মহিলা। তিনি জানলেন, বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিবলয়ে মন্দির নৃত্য

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের ভূমিকায় অয়ন মুখোপাধ্যায় ও মেঘনাদের ভূমিকায় ড. দেবাশিস সরকার।

ছিল এবং দেবতার সমীপে তার প্রদর্শনও ছিল বহুল প্রচলিত। পাল রাজাদের শাসনকালে পাহাড়পুরের দেউল ভাস্কর্য যে সব নৃত্যপর নারী-পুরুষদের দেখা যায়, বাংলার নৃত্যকলার নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের 'পাথুরে প্রমাণ' বলে সেগুলিকে মেনে নিতেই হয়।

ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, বর্তমানে যিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যবিভাগের অধ্যাপিকা— নিরলস অনুসন্ধান, গবেষণা আর প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে সন্ধান পেয়েছেন বাংলার নিজস্ব নৃত্যশৈলী গৌড়ীয় নৃত্যের। বাংলার নিজস্ব নৃত্যশৈলীতে ঋদ্ধ একটি সুপ্রাচীন শিল্পধারা, যাকে সংস্কৃতিতত্ত্বের পণ্ডিতেরা এবং নৃত্যবিদুষী শিল্পী মহলের বৃহত্তম অংশ 'গৌড়ীয় নৃত্য' বলে অভিহিত করেছেন, তার পুনরভ্যুদয় হয়েছে ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের নিরলস প্রয়াসে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের নৃত্য-পণ্ডিতেরা প্রথম প্রথম প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন। গৌড়ীয় নৃত্যকে এই ধ্রুপদী নৃত্যশৈলী হিসেবে মানতেই চাননি। সবাই বাংলার নিজস্ব নৃত্যশৈলীর পুনরুত্থানের সম্যক বিরোধিতা করেছেন একযোগে। ডঃ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি স্থানে সেমিনার করেছেন, স্লাইড সহযোগে ডেমনেস্ট্রেশন দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সকলে গৌড়ীয় নৃত্যকে মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছেন। আনন্দের কথা, ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর ভরতনাট্যম, ওড়িশি, কথাকলি প্রভৃতি নৃত্যের শিক্ষার্থীদের যেমন জুনিয়র, সিনিয়র, ফেলোশিপ দিচ্ছেন, তেমনি গৌড়ীয় নৃত্যের শিক্ষার্থীরাও ভারত সরকারের বৃত্তি পাচ্ছেন। শুধু তাই নয় ডঃ মুখার্জির বিগত ৩১ বছরের গৌড়ীয় নৃত্যের শিক্ষাদানের ফলে আজ বহু গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী জীবনে প্রতিষ্ঠিত। অনেকে গৌড়ীয় নৃত্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌড়ীয়নৃত্য শিক্ষার পৃথক বিভাগ আছে।

ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব নৃত্যশিক্ষালয় 'গৌড়ীয় নৃত্যভারতী'তে গৌড়ীয় নৃত্যশৈলীর আঙ্গিকে একদিকে যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, দশাবতার প্রভৃতি নৃত্যানুষ্ঠান করছেন তেমনি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য, নজরুলগীতির সঙ্গে এই নৃত্যশৈলীতে বহু অনুষ্ঠান করেছেন। সম্প্রতি (৯.৮.১৪) মধুসূদন মঞ্চে গৌড়ীয় নৃত্যভারতীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে এমনই পরীক্ষামূলক দুটি নৃত্যনির্মিতি দেখার সুযোগ হলো। বৈষ্ণব সাহিত্যে নারীর বিভিন্নরূপ অর্থাৎ আনন্দ, বেদনা, বিরহ, উপেক্ষা প্রভৃতি ভাবের আটটি রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রবীন্দ্রনাথের আটটি গানের সঙ্গে অপূর্ব এক নৃত্য নির্মিতি দেখলাম। আঙ্গিক অবশ্যই গৌড়ীয় নৃত্যের। শিরোনাম ছিল 'রবির গানে অষ্ট নায়িকা'। 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে', 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে', 'তুমি কি কেবলি ছবি'— এমন আটটি গানের সঙ্গে। প্রত্যেকটি গানের গায়ন অপূর্ব। গানগুলি গেয়েছেন গৌড়ীয় নৃত্যভারতীর ছাত্রছাত্রীরা। যারা গৌড়ীয় সঙ্গীতের ওপর গবেষণা করছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন গৌড়ীয় সঙ্গীতের গবেষক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠটি অপূর্ব। গৌড়ীয় সঙ্গীতের অন্যতম বৈষ্ণব পদাবলী এঁর কণ্ঠে যেন আলাদা মাত্রা পায়।

এই সন্ধ্যায় আর একটি নিবেদন গৌড়ীয় নৃত্যশৈলীতে মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। অভিনব প্রয়াস। গোড়ীয় নৃত্য ভারতীর পাঁচ থেকে ষাট প্রায় সব শিক্ষার্থী ও প্রাক্তনী এতে অংশ নিয়েছেন। পাঁচ বছরের শিশু যেমন আছে— তেমনি ৩০ বছরের পুরনো ছাত্র-ছাত্রীরাও আছেন। সুন্দর উপস্থাপনা। পৃথক পৃথক ভাবে নাম বলা সম্ভব নয় তবু রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্রে অয়ন মুখোপাধ্যায় ও ড. দেবাশিস সরকার অনবদ্য। এছাড়া সুদেষ্ণা, কৌশিক, শতাব্দী ও ধর্মেন্দ্রকে ভালো লাগে। এই প্রযোজনায় নাট্যাংশ রেকর্ডেড ভয়েসে দেওয়া হয়েছে। কণ্ঠ দিয়েছেন জগন্নাথ বসু, ঊর্মিমালা বসু, মণীশ মিত্র, মহুয়া মুখোপাধ্যায় ও অমিতাভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আলাদা করে বলতে হয় পোশাকের কথা। সৈন্যবাহিনীর পোশাক নজর কাড়ে। সেই সঙ্গে সৈন্যদলের নাচও অপূর্ব। গৌড়ীয় নৃত্যভারতী এই ভাবেই নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গৌড়ীয় নৃত্যশৈলীকে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছেন। স্বদেশে- বিদেশে বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী নৃত্যকলা এইভাবে বিস্তার লাভ করুক— এই প্রার্থনা।

শব্দরূপ-৭১৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

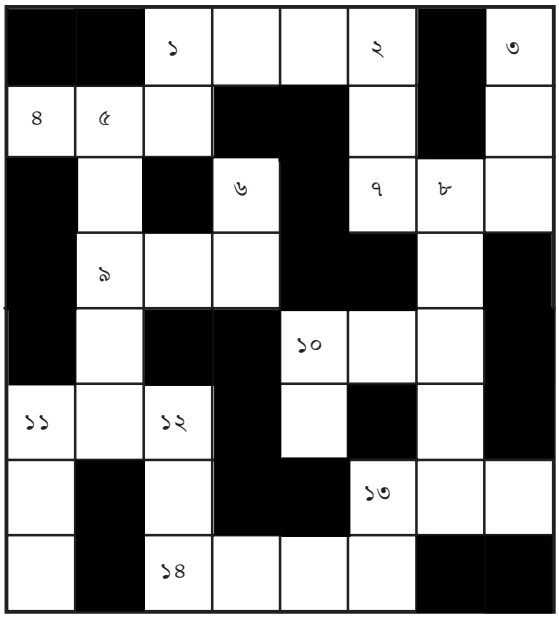

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন; শিব, **৪.** চাউল বহিবার নৌকা (নোয়াখালি বাকরগঞ্জ ইত্যাদি স্থানের), **৭.** সমস্ত, সকল, **৯.** মুক্তিদান, অপনোদন ('শাপ—') **১০.** যে বন্দোবস্তে উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের একভাগ মালিকের এবং দুই ভাগ চাষির প্রাপ্য হয়, **১১.** অপ্সরা বিশেষ, শকুন্তলার জননী, **১৩.** কশ্যপপত্নী; অরুণ ও গরুড়ের জননী, **১৪.** 'যত দোষ,—'।

উপর-নীচ : ১. একটি সাধারণ ফল, **২.** ছয় মাস, **৩.** সপ্তর্ষির অন্যতম, **৫.** 'জটায়ু' ছদ্মনামে লেখক—গাঙ্গুলী, **৬.** 'কালি, কলম,—/ লেখে তিনজন', **৮.** প্রধান গায়ক, **১০.** হাত পায়ের চেটো; ব্রহ্মতালু, **১১.** 'সবুরে—ফলে', **১২.** অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত, **১৩.** গরল, হলাহল।

সমাধান
শব্দরূপ-৭১৬
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	গ	ণ্ড	যো	গ	■	কী
অ	সি	ত	■	■	ণ্ডা	■	চ
■	দ্ধ	■	য	■	র	জ	ক
■	পু	প্প	ক	■	■	হ	■
■	রু	■	■	পু	ষ্ক	র	■
পৌ	ষ	ল্যা	■	রু	■	ব্র	■
লো	■	ং	■	■	র	ত	ন
মী	■	চা	ন্দ্রা	য়	ণ	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭১৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দাবৈরাগী ।। ৪

জাতীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধন পরম্পরার অরূপরতন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২১

উপন্যাস

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় □ শেখর সেনগুপ্ত □ সুমিত্রা ঘোষ

প্রবন্ধ

স্বামী অরুণানন্দ, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, দেবীপ্রসাদ রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন সেন, তাপস অধিকারী, তথাগত রায়, সবুজকলি সেন, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, গোপালকৃষ্ণ রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র দাশগুপ্ত, জিষ্ণু বসু, চণ্ডী লাহিড়ী প্রমুখ।

এছাড়াও অন্যান্য রচনায় সমৃদ্ধ।

সবমিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো
একটি সংরক্ষণযোগ্য পূজা সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৭০ টাকা।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
18 August - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা